বিশেষ সংখ্যা

সম্প্রীতি দিবস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২০ ❖ ৫ - ১১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পঞ্চাশত্তমী মহা পর্বোৎসব

সংলাপ : সম্প্রীতি ও শান্তি

সংলাপের মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়

সংলাপ হলো নিত্যস্থায়ী শান্তির ব্যাকরণ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত জন ডি'কস্তা

জন্ম: ২ মে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মহাখালী, ঢাকা

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম"

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে দুইটি বছর চলে গেল। ফিরে এলো সেই স্মৃতিময়, শোকাহত স্মরণীয় দিনটি, যেদিন তুমি ইহজগতের সমস্ত স্নেহ ও মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছ।

তোমার সেই স্মৃতিময় দিনগুলো আজও আমাদের কাঁদায়। স্বর্গধাম হতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো বাবা। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায় –

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে —
বড় ছেলে-ছেলে বউ: টিটু ও জুঁই ডি'কস্তা
নাতী: দূর্লভ ও দর্পণ ডি'কস্তা
মহাখালী, ঢাকা

ছোট ছেলে - ছেলে বউ: লিটু ও লীনা ডি'কস্তা
নাত্নী: গ্রেস ও এনজেল ডি'কস্তা
টরন্টো, কানাডা
সহধর্মিনী: আন্না ডি'কস্তা

বিজ্ঞ/১৫৭/২০২২

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

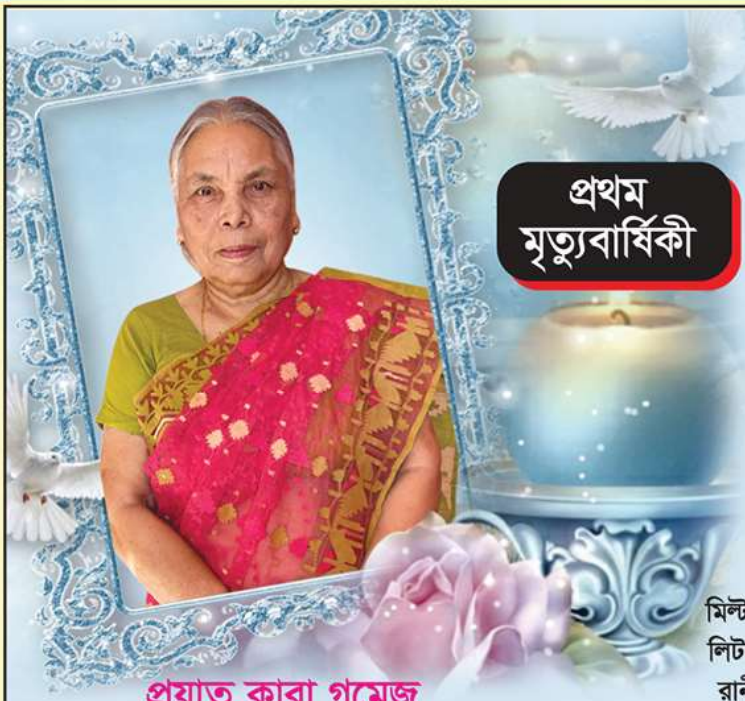

প্রয়াত ক্লারা গমেজ

জন্ম: ২৮ মার্চ, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

**"সে যে ছিল মোদের আপন জন,
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন"**

আমাদের মা ক্লারা গমেজ গত ২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে অনন্তধামে চলে গেছেন । মায়ের অনুপস্থিতি আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। ব্যাক্তিগত জীবনে মা ছিলেন ধার্মিকা, সহজ-সরল, সর্বদা হাসিখুশি, কর্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারী একজন মানুষ । জীবনকালে মা আমাদের শিখিয়েছেন মানুষকে ভালোবাসতে ও সর্বদা উপকার করতে । মায়ের খ্রিস্টীয় আদর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে। আমাদের দৃঢ় প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন তোমাকে তাঁর গৃহে চির শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী :
মিল্টন গমেজ ও ইলা গমেজ-বিশাল ও বিবেক
লিটন গমেজ ও বিউটি গমেজ-নম্রতা ও নিলয়
রানী গমেজ ও সমর রোজারিও-পার্থ ও পার্ঘ
লাইলি গমেজ ও ভানু কস্তা-জুঁই ও পারক
আইভি গমেজ ও সমর গমেজ-শ্রুতি ও পৃথু
উত্তর রাজনগর, নয়াবাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

ভাই-বোন: পিটার, যাকোব ও মিলন ডি'ক্রুজ, মমতা, হেলেন ও স্বপ্না ডি'ক্রুজ
জয়রামবের, রাঙ্গামাটিয়া মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৬৪/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ২০
৫ - ১১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২২ - ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

সংলাপের বিস্তৃতি আনবে শান্তি-সম্প্রীতি

যিশুর পুনরুত্থান পর্বের পঞ্চাশ দিন পরে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার অবতরণ বা পঞ্চাশত্তমী পর্ব পালন করে। যেদিনে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা ভীত-সন্ত্রস্ত প্রেরিতশিষ্যদের উপর নেমে এসে তাদেরকে সাহসী করে তুলেন, বিভিন্ন ভাষা বুঝার ক্ষমতা দিয়ে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যতার মধ্যেও একতা ও মিলন সৃষ্টি করেন। পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী শুক্রবারটিতে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সম্প্রীতি দিবস পালন করা হয়। এ বছর তা উদ্‌যাপিত হবে ১০ জুন। সম্প্রীতি অর্থাৎ অন্যকে সমান ভাবে প্রীতি করা মহৎ কিন্তু কঠিন একটি কাজ। বিশেষভাবে বর্তমানের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ভোগবাদী ও স্বার্থপর সংস্কৃতির বলয়ে সম্প্রীতি আনয়ন বেশ কঠিন। এমনিতর সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী যুক্ত হয়ে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা আরো কঠিন হয়ে তুলেছে। তবে আশাপ্রদ দিক হচ্ছে এখনো পৃথিবীর অনেক মানুষ আছে যারা সম্প্রীতির বন্ধনকে টিকিয়ে রেখেছে। কোভিড-১৯ সবাইকে এক কাতারে নামিয়ে এনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সম্প্রীতির কত বেশি প্রয়োজন। এই কঠিন সময়েও সম্প্রীতির জয়গান রচনা করে বিভিন্ন দেশ করোনা ও যুদ্ধ আক্রান্ত দেশগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে।

সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশও সম্প্রীতির দেশ বলে পরিচিত। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট শত শত সমস্যা মোকাবেলা করেও এ দেশের মানুষ এগিয়ে চলছে আপন গতিতে। আম্ফান ও করোনার মতো ধ্বংস ও ক্ষতিকারক বিষয়গুলোও ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে যাচ্ছে। মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া, অল্পতে সন্তুষ্টি, বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, সহজ-সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্থতা, ধর্মভীরুতা, সহিষ্ণুতা কিন্তু প্রয়োজনে প্রতিবাদী হওয়া প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে বেশ দৃঢ়ভাবেই আছে। এসকল শুভ মূল্যবোধের সাথে আমাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে দরকার পরস্পরকে শ্রদ্ধা, অন্যের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসকে সম্মান করা, নৈতিকতায় বলীয়ান হওয়া, নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ধর্মান্ধ ও জঙ্গিবাদের মানসিকতা ত্যাগ করা, উন্নাসিকতা ছাড়া, পরচর্চা-পরশ্রীকাতরতা বাদ দেওয়া, মিথ্যা-অসত্য-ঈর্ষা ত্যাগ করা এবং প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি আরো দরদী ও যত্নশীল হওয়া ইত্যাদি।

শ্রদ্ধা ও সম্মানের কৃষ্টি সৃষ্টি করতে হলে প্রয়োজন উন্মুক্ত হৃদয়ে সংলাপ। বর্তমানের বৈশ্বিক ও দেশীয় এই জটিল পরিস্থিতিতে সংলাপের বিকল্প আর কিছু নেই। সংলাপ হলো একে অন্যকে শোনা, মতবিনিময় এবং একসঙ্গে চলার অঙ্গীকার। সংলাপে অন্যকে প্রভাবিত না ক'রে সবাইকে একে অন্যের জন্য অবস্থান তৈরি করতে হবে। আর তারজন্য পরস্পরকে শ্রবণ করতে হবে। অন্যের কথা মনোযোগের সাথে শুনতে পারাই সংলাপের সূচনা।

একসময় আনুষ্ঠানিক সংলাপে ধর্মীয় বিষয়সমূহ আলাপ-আলোচনায় প্রাধান্য পেলেও বর্তমানে জীবনমান উন্নয়নের জন্য সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেই স্বীকার করছে। পোপ মহোদয়গণ যেকোন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা-সংকট উত্তরণের জন্য সংলাপকেই হাতিয়ার করতে বলছেন। আমাদের দেশের সুষ্ঠু-সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ব্যাপারেও সংলাপের কথাই বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজের সাথে সংলাপে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজেও দৃশ্যমান ও দীর্ঘসময়ে চলমান বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো প্রকট হচ্ছে সংলাপহীনতায়। সমস্যা সৃষ্টিকারীরা নিজেরা যেমনি সংলাপে বসতে সাহস পাচ্ছেন না তেমনি নেতৃত্বদানকারী সমাজ বা ধর্মনেতারাও বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে কার্যকর সংলাপ সৃষ্টি করতে পারছেন না। কিন্তু সকলকেই মনে রাখতে হবে, সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে সংলাপের মাধ্যমেই। তাই আন্তঃমাণ্ডলিক, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ যেমনি প্রয়োজন তেমিন প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে সংলাপ যাতে করে বিভেদ-বিবাদ দূর হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শান্তি স্থাপনের জন্য আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আর তা শুরু হবে ব্যক্তি ও পরিবার থেকে এবং চলমান থাকবে শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান-সংগঠনসমূহে। আমরা শান্তি-সম্প্রীতিতে থাকতে চাইবো কিন্তু তারজন্য শিক্ষা গ্রহণ করবো না, তাতো হবে না। স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতি গড়তে চাইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে সর্বস্তরে সংলাপ।

সংলাপ সকলস্তরে অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে, কর্মে কর্মে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অব্যাহত রাখতে হবে। এগুলো যথার্থভাবে ও ব্যাপক আকারে চলমান থাকলে মানুষের মাঝে জাগবে সম্প্রীতি আর শান্তি আসবে সমাজে। †

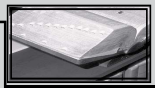

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। *(যোহন ১৪:১২)*

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

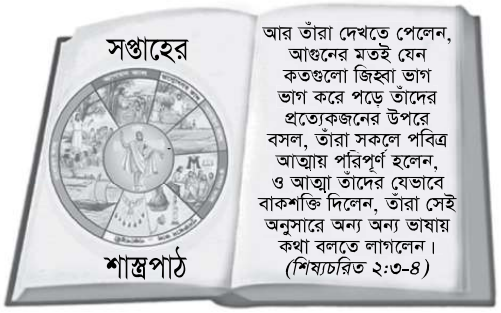

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৫ - ১১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৫ জুন, রবিবার
শিষ্য ২: ১-১১, সাম ১০৪: ১, ২৪, ২৯-৩১, ৩৪, রোমীয় ৮: ৮-১৭, যোহন ১৪: ১৫-১৬, ২৩-২৬

৬ জুন, সোমবার
খ্রিস্টমণ্ডলীর মাতা মারীয়া, স্মরণদিবস
আদি ৩: ৯-১৫, ২০ (বিকল্প: শিষ্য ১: ১২-১৪), সাম ৮৬: ১-২, ৩, ৫, ৬-৭, যোহন ১৯: ২৫-৩৪
অথবা
সিরাখ ১৭: ২৪-২৯, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭, মার্ক ১০: ১৭-২৭

৭ জুন, মঙ্গলবার
১ রাজা ১৭: ৭-১৬, সাম ৪: ১-৪, ৬-৭, মথি ৫: ১৩-১৬

৮ জুন, বুধবার
১ রাজা ১৮: ২০-৩৯, সাম ১৬: ১-৫, ৮, ১১, মথি ৫: ১৭-১৯

৯ জুন, বৃহস্পতিবার
চিরকালীন মহাযাজক প্রভু যিশু খ্রিস্ট, পর্ব
ইসা ৬: ১-৪, ৮ (বিকল্প: হিব্রু ২: ১০-১৮), সাম ২৩: ১-২, ৪, ৫, যোহন ১৭: ১-২, ৯, ১৪-২৬

১০ জুন, শুক্রবার
১ রাজা ১৯: ৯, ১১-১৬, সাম ২৭: ৭-৯, ১৩-১৪, মথি ৫: ২৭-৩২

১১ জুন, শনিবার
সাধু বার্ণাবাস, প্রেরিতদূত, পর্ব
শিষ্য ১১: ২১-২৬; ১৩: ১-৩, সাম ৯৮: ১-৬, মথি ১০: ৭-১৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৫ জুন, রবিবার
+ ১৯৫১ ফাদার ভিত্তোরিও পেলেগ্রিনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭০ ব্রাদার ভিক্টর এক্কা (দিনাজপুর)

৬ জুন, সোমবার
+ ১৯২৪ সিস্টার এম. এলজিয়ার আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার জুসেপ্পে জিত্তি এসএক্স (খুলনা)

৮ জুন, বুধবার
+ ১৯৭১ সিস্টার ইম্মানুয়েল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

৯ জুন, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৬ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুন, শুক্রবার
+ ১৯৯৬ সিস্টার জুলিয়ানা বল্লিও ওএসএল
+ ২০০৩ সিস্টার জেমস ভলয়াথো এসসি (ঢাকা)

খেলাধুলা করি, মাদক থেকে দূরে থাকি

দড়িপাড়া গ্রামে যুবকেরা বিভিন্ন ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় খেলাধুলার আয়োজন করছে। যা খুবই সময় উপযোগী এবং বাস্তবধর্মী উদ্যোগ। সাধুবাদ জানাই তাদের এমন মহৎ উদ্যোগের জন্য। 'খেলাধুলা করি, মাদক থেকে দূরে থাকি'- এমন নাম দিয়ে তারা ব্যানার তৈরী করে খেলার আয়োজন করছে, বিভিন্ন ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায় জার্সি, প্যান্ট ও ক্রেস্ট প্রদান করছে। যুবকদের এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রসংশার দাবিদার। মাদক গ্রহণের প্রভাব কমবেশি সব এলাকাতেই রয়েছে। অনেক সময় মানসম্মানের ভয়ে অনেক পরিবার তা প্রকাশ করতে চান না। মাদকের কারণে পরিবারে অশান্তি, কলহ বা ঝগড়াঝাটি হরহামেসাই ঘটে থাকে। অনেক পরিবার ভেঙ্গে গেছে। এমনকি নি:স্ব হয়ে গেছে। গড়ছে ঋণের পাহাড় যার ঘানি পিতা-মাতাকে বহন করতে হচ্ছে। মাদকের জন্য পুলিশ কেস কিংবা মৃত্যুর ঘটনা যে ঘটেনি তাও কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে বিনোদন একটি। খেলাধুলা শুধু বিনোদনই দেয় না, সাথে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি নিজের নৈপুন্য, দক্ষতা ও মেধা দেখাতে পারে। খেলাধুলার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি গ্রামে, ধর্মপল্লীতে এবং স্কুলে পরিচিতি লাভ করতে খুবই সাহায়ক ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া বড়দের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সমবয়সীদের সাথে দৃঢ় বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক তৈরী হয়।

আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যখন আলাপ করি, তখন তারা নির্দিধায় বলে, ছেলেকে নিয়ে সব সময় চিন্তা হয়, কোথায় যায়, কি করে, কাদের সাথে মেলামেশা করছে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। কিন্তু মাঠে খেলতে গেলে নিশ্চিত হতে পারি, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকি। তাছাড়া বাড়িতে থাকলে ট্যাব/মোবাইল ফোন নিয়ে সারাদিন ভিডিওগেম খেলায় মত্ত থাকে। যা ইন্টারনেট যুগের খুবই বাস্তব চিত্র। এখন অনেক ছেলে-মেয়েরা মাঠে খেলতে যেতে চায় না। অথচ আমাদের মাঠ থেকে খেলা ফেলে ঘরে ফিরতে হতো লাঠির ভয়ে।

সমাজে যারা বিত্তবান রয়েছেন তাদের সদয়দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, নিজ গ্রামের যুব সংঘঠনগুলোকে আর্থিক সাহায্য, খেলাধুলা সামগ্রী, উপহার, পরামর্শ দান কিংবা উপদেশ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে জীবনটা উপভোগ করা যায়, অবসাদ দূর হয়। মাদক গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। আজকের যুবকেরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারাই একদিন সমাজকে পরিচালনা দান করবে। বিয়ে, মৃতদেহ সৎকারসহ বিভিন্ন সামাজিক কাজ তারাই করে থাকে। উঠতি বয়সের যুবকদের মনে ও দেহে অপ্রতিরুদ্ধ শক্তি কাজ করে। যুব সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের সকলের এগিয়ে আসা উচিৎ। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন,

"আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ,
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।"

ডিকন সনি রোজারিও, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৫ জুন, খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্প্রীতি দিবস

শিক্ষা, কাজ এবং সংলাপ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে: স্থায়ী শান্তি স্থাপনের হাতিয়ার

এ বছর ১০ জুন আমরা বিশ্ব সম্প্রীতি দিবস পালন করছি। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস শান্তি দিবস উপলক্ষে ১ জানুয়ারি ২০২২ ভাটিকানে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যদিয়ে শান্তি দিবস উপলক্ষে বাণী রেখেছেন। এ বছর যে বাণী রেখেছেন তার বিষয়বস্তু ছিল: শিক্ষা, কাজ (শ্রম) এবং সংলাপ, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। পোপ ষষ্ঠ পৌল বলেছিলেন: শান্তির পথে চলার অন্য নামই হলো মানুষের সামগ্রিক উন্নতি। যদিও জাতিগণের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু যুদ্ধের ডামাঢোল যেন মানুষের কানে পৌঁছছে না, সেজন্য দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের জন্য বিভিন্ন রোগের বিস্তার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং পরিবেশ বিপর্যয় যেন আরও বিপদজনক পর্যায়ে উঠছে। মানুষের ক্ষুধা ও দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বের প্রবক্তারা যেভাবে বলেছিলেন বর্তমানেও সেটা প্রযোজ্য: দরিদ্রদের কান্না ও ধরিত্রীর কান্না যেন ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জোর দাবী আমাদের কাছে জানাচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, শান্তি স্থাপনের জন্য তিনটি পথ রয়েছে: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সাথে সংলাপ যা হলো যৌথ প্রকল্পের ভিত্তি। শিক্ষা দান স্বাধীনতা, দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্যে। পরিশেষে, শ্রমের মধ্যদিয়ে মানুষ পূর্ণভাবে মানব মর্যাদা লাভ করে। এই তিনটি বিষয় হলো শান্তি স্থাপনের অপরিহার্য উপাদান।

প্রথমত: করোনা ভাইরাসের ফলে মানব সমাজে অবর্ণণীয় কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে কেউ কেউ সমস্যা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছে আবার কেউ কেউ নিজের ক্ষুদ্র জগতে আশ্রয় নিয়েছে আবার অন্যেরা সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছে। পাশাপাশি এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, বিশ্বের সর্বত্র মানুষের মধ্যে ছিল একটা উদারতা ও সহভাগিতার মনোভাব। সংলাপ দাবী করে অন্যের কথা শুনা, বিভিন্ন মতামত সহভাগিতা, একমত হওয়া এবং পরে একসাথে পথ চলা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংলাপের জন্য প্রয়োজন হলো দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ও উদাসিনতার অনুর্বর ভূমি ধ্বংস করে ফেলা যাতে আমরা স্থায়ী শান্তির বীজ বপন করতে পারি। এই ধরনের সংলাপে যুবকদের জন্য দরকার বয়স্কদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং প্রবীণদের প্রয়োজন যুবাদের সমর্থন, ভালবাসা, সৃজনশীলতা ও প্রাণবন্ত সক্রিয়তা। আমাদের সবার বসতবাটির যত্ন নিতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। বড়দের অবশ্যই যুবাদের মূল্যায়ন এবং উৎসাহিত করতে হবে বিশেষ করে যারা আরও ন্যায্যতাপূর্ণ বিশ্ব গড়ার কাজে নিয়োজিত এবং যারা বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করার কাজে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা সংলাপের জন্য দান করে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে যাবার উপায় ও পদ্ধতি এবং শ্রমে বিভিন্ন প্রজন্মের নারী-পুরুষ একত্রে সাহায্য সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা সহভাগিতার মাধ্যমে লাভ করে সর্বজনীন গণমঙ্গল করার দক্ষতা।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষা ও জ্ঞান যা হলো শান্তি স্থাপনের চালিকা শক্তি: বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অনুদান অনেক কমে গিয়েছে। শিক্ষার জন্য ব্যয় করার অর্থ হলো ভবিষতের জন্য বিনিয়োগ করা। শিক্ষা ও জ্ঞানই হলো সার্বিক মানব উন্নয়ন ও শান্তি স্থাপনের উপায়। অন্যভাবে বলা চলে যে, শিক্ষা দান ও জ্ঞান হলো সহ-অবস্থানমূলক সমাজকে সক্ষম করে তুলে আশা, উন্নয়ন ও প্রগতির সৃষ্টি। সমর অস্ত্রে অর্থ ব্যয় না করে বরং শিক্ষা বিস্তারে অর্থ ও সম্পদ ব্যয় করতে হবে। বাজেটের বড় অংশে থাকতে হবে সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভূমির যত্ন ইত্যাদি। শিক্ষার সাথে সাথে যত্নের কৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে। শান্তি স্থাপনের জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে: ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার সবাইকে শান্তি স্থাপনে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দান করতে হবে যাতে তারা সবাই শান্তি স্থাপনে অভিজ্ঞ ও পরিপক্ক নর-নারী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত: শান্তি স্থাপন ও রক্ষার জন্য মানব শ্রম একটি অপরিহার্য উপাদান। শ্রম আমাদের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ ও শ্রমের মধ্যদিয়ে অবদান রাখি, একই সাথে আমাদের আত্মত্যাগ, আত্মদান, বিনিয়োগ এবং অন্যের সাথে সহযোগিতায় প্রবেশ করি কারণ আমরা প্রত্যেকে অন্যের সাথে এবং অন্যের জন্য কাজ করি। আমাদের কাজ ও শ্রমের ফলে গড়ে তুলি আরও বাসযোগ্য ও সুন্দর পৃথিবী।

বর্তমানে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি মানুষের শ্রমের স্থান দখল করে নিচ্ছে। প্রযুক্তি কখনো মানুষের স্থান দখল করতে পারে না। কাজ ও শ্রম মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলে, কাজের মধ্যদিয়ে সে বৃদ্ধি লাভ করে এবং পরিপক্কতা লাভ করে। এর মধ্যদিয়ে মানুষ তৃপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করে। এটা খুবই জরুরী যে কাজের শর্ত সমূহ আরও মানবিক ও সম্মানজনক হতে হবে, যা গণমঙ্গলের দিকে ধাবিত করে এবং সৃষ্টিকে লালন ও রক্ষা করার লক্ষ্যে চালিত হয়। এসো আমরা সকলে সাহসিকতার সাথে সৃজনশীলভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের সাথে সংলাপ, শিক্ষা এবং কাজ করি। অনেক নর-নারী নম্রতার সাথে যেন দৈনন্দিন জীবনে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে শান্তি স্থাপনের কারিগর হয়ে ওঠে। শান্তির ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই

খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও সংলাপ কমিশনের সভাপতি।

সম্প্রীতি দিবস উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনা সভা

মূলসুর : নিত্যস্থায়ী শান্তি বিনির্মাণের মাধ্যম সংলাপ, শিক্ষা ও কর্ম

Dialogue Between Generations, Education and Work: Tools for Building Lasting Peace

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পরিবেশ গঠন: সম্প্রীতি দিবসের পোস্টার হিসাবে থাকতে পারে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। সেখানে সব পর্যায়ের লোক থাকবে: বয়স্ক, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, হুজুর-পুরোহিত, বিশপ-ফাদার-সিস্টার। জলছাপ থাকবে: বড় একটি পায়রা, মুখে সবুজ পাতা। প্রবেশ শোভাযাত্রাকালে পোস্টারটি উচুঁ করে একজন ধরে রাখবে। বেদীর সামনে আসলে পোস্টারটি বেদীর সামনে বা দৃশ্যমান কোন উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা যায়। মূলসুর ভিত্তিক অন্য অর্থপূর্ণ পোস্টারও তৈরী করা যেতে পারে।

প্রবেশ অনুষ্ঠান

শোভাযাত্রা: সেবকদল নৃত্যকন্যাদের নিয়ে পৌরহিত্যকারী যাজক পুণ্য বেদীর দিকে অগ্রসর হবেন। নৃত্যকন্যাদের পরিধানের কাপড় হতে হবে চাক্চিক্যহীন সাধারণ, কোমল ও নমনীয়। তাদের নৃত্যের অঙ্গ-ভঙ্গী ও মুদ্রাগুলো শান্তি-সম্প্রীতি প্রকাশ করবে। এরা থাকবে সবার আগে। যাজকদের স্বাগতম জানিয়ে বেদীমঞ্চে নিয়ে যাওয়াই নৃত্যকন্যাদের আসল উদ্দেশ্য। তাদের পিছনে, সর্বাগ্রে থাকবে ধূপ বহনকারী। ধূপের ধুয়ো উড়তে থাকবে। এদের পিছনে থাকবে জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে দুই সেবক মাঝখানে বড় ক্রুশ হাতে সেবক। তাদের পিছনে অন্যান্য সেবক। সবার পিছনে পৌরহিত্যকারী যাজক (ফাদার বা বিশপ) ও তাঁর দু'পাশে বেদীমঞ্চে সহার্পণকারী যাজকগণ। পবিত্র বাইবেল বা মঙ্গলবাণী হাতে উঁচু করে রাখা একজন ডিকন বা যাজক থাকবে পৌরহিত্যকারী যাজকের সামনে।

শোভাযাত্রাকালে গান:

(১) নন্দিত মনে প্রভুর ভবনে (গীতাবলী ২২)
(২) এসো এসো আমরা প্রভুর করি আনন্দ গান (গীতাবলী ৩৯৭)
(৩) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে (গীতাবলী ১৪১০)

পৌরহিত্যকারী ও সহার্পণকারী যাজকগণ বেদীর নিকট পৌঁছলে পবিত্র ক্রুশের প্রতি আনত মস্তকে ভক্তি প্রদর্শন করার পর বেদী চুম্বন করেন। পৌরহিত্যকারী বেদীর চারিদিকে ধূপায়ন করেন। অতঃপর সবাই বসে।

ভূমিকা: সম্প্রীতি দিবসের তাৎপর্য: সম্প্রীতি দিবসের পটভূমি বা ভিত্তি হল ত্রিত্বিক মিলন বা সম্প্রীতি। কাথলিক মণ্ডলীর কেন্দ্রিয় ঐশরহস্য হল পবিত্রত্রিত্বের রহস্য: পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই পবিত্র ত্রিত্বের প্রত্যেকজন একেক সত্তায় এক ও একক এবং ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। আবার এই তিন সত্তা মিলে এক ঈশ্বরের প্রকাশ। তিনজনের **স্বরূপ ভিন্ন:** পিতা সৃষ্টিকর্তা, পুত্র ত্রাণকর্তা ও পবিত্র আত্মা নিত্য সহায়ক জীবনদাতা। এই ত্রিত্বের মধ্যে আমরা দেখি এককত্ব, আবার মিলনত্ব। তিনের মধ্যে মিলন দ্বারা তাঁরা এক। আমরা কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন করেই এই ত্রিত্বের মিলন প্রকাশ করি। আমরা ত্রিত্বের মিলন স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হই।

ত্রিত্বের চেতনায় সম্প্রীতি: যেখানে শুধু একক বা শুধুই "আমি" আর "আমি" (egoism), আমি এটা করলাম, ওটা করলাম; আমি সবার আগে সম্পন্ন করলাম, আমি না থাকলে হতই না, ইত্যাদি শুধুই প্রকাশ করে: অন্যকে তুচ্ছ, আর শুরু হয় যুদ্ধ; ক্ষমতার যুদ্ধ, পদমর্যাদার যুদ্ধ। এমন পরিবেশে তো শুধু আমিত্বেরই প্রকাশ পায়। এখানে মিলন বা এক সাথে পথ চলার কোন চিহ্নই থাকে না। বর্তমানকালে এমনটি যে নেই তা হলপ করে বলা যাবে না। তবে সম্প্রীতি দিবসের যে চিন্তা তা 'আমি'র ক্ষুদ্র বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সর্বজনীন বা সিনোডাল বৃত্তকে নিয়ে। আদর্শ পবিত্র ত্রিত্ব।

ত্রিত্বিক ঐক্য ও ত্রিত্বিক মিলন: কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রিয় রহস্য হল পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য: পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। ত্রিত্বের প্রত্যেকটি সত্তা আপন সত্তায় এক ও একক এবং ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর। আবার এই তিন ব্যক্তি একত্রে এক ঈশ্বরের প্রকাশ, ত্রিত্ব ঈশ্বর। পিতা সৃষ্টিকর্তা, পুত্র মুক্তিদাতা ও পবিত্র আত্মা নিত্যসহায়ক জীবনদাতা। পবিত্র আত্মা পুত্রের উপর নিত্য অধিষ্ঠিত বলেই পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের দেওয়া মিশনকর্ম পূর্ণভাবেই সম্পাদন করতে পেরেছিলেন *(ইসাইয়া ৬১:১-২; লুক ৪:১১-১৮)*। সম্পূর্ণ মিলনাত্মক হয়ে ত্রিত্বের অবস্থান। এক নীরব সংলাপ, এক নীরব মুক্তি-কার্যসাধন। পবিত্র ত্রিত্বের এমন মিলন-চেতনাতেই প্রতি বছর সম্প্রীতি দিবস উদ্‌যাপন; করে একে অন্যকে আপন।

সম্প্রীতি দিবস কখন ও কোন দিন? পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরবর্তী এবং পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্বের পূর্ববর্তী শুক্রবার। তারিখ বদল হয়, (গত বছর ছিল ২৮ মে, এ বছর ১০ জুন); কিন্তু দিনের বা দিবসের অবস্থান ঠিক থাকে, তথা শুক্রবার। পঞ্চাশত্তমী তথা পবিত্র আত্মার অবতরণ প্রকাশ করে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দান (বিভিন্ন ভাষা); তবে একই বাণী প্রচার, একই বাণী গ্রহণ। ত্রিত্বের মহাপর্ব। পবিত্র ত্রিত্ব প্রকাশ করে এককত্ব ও মিলনত্ব। তিনে মিলে এক। এই দুইয়ের মাঝখানে যে শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটি, সেই দিন সম্প্রীতি দিবস: পঞ্চাশত্তমীর বহুত্বের মধ্যে ঐক্য এবং পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যে এক ও একক। এক কথায় সম্প্রীতি। এবারের সম্প্রীতি দিবস হল ১০ জুন ২০২২ শুক্রবার।

সম্প্রীতি দিবস ২০২২: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পুণ্যপিতার কোন বাণী বা পালকীয় পত্রের আলোকে সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর বেছে নেওয়া হয়। এই বছর বিশপীয় খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ১ জানুয়ারির আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের বাণীর আলোকে সম্প্রীতি দিবসের মূলসুর নির্ধারণ করেছে "টেকসই শান্তি বিনির্মাণে সংলাপ, শিক্ষা ও কার্যক্রম" (Dialogue, Education and Work for Building Sustainable Peace)। ব্যাখ্যা করলে সরলভাবে বলা যায়: শান্তি ধারণা হয়েই থাকবে যদি কিছু না করা হয়। শান্তি স্থাপন করতে হয়, গড়ে তুলতে হয়, বিনির্মাণ করতে হয়। আর এর জন্য সংলাপ করতে হয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে, এর উপর শিক্ষা অর্জন করতে হয় এবং সে অনুসারে শান্তি বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হয়। আসুন আমরা এবারের মূলসুর নিয়ে সম্প্রীতি দিবস উদ্‌যাপন করি; শান্তি-সম্প্রীতি বিনির্মাণের জন্য প্রার্থনা করি, আজকের এই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করি এবং মূলসুর ভিত্তিক অন্যান্য কার্যক্রম হাতে নেই।

(সকলে দাঁড়ালে পর পৌরহিত্যকারী যাজক পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করেন।)

ক. প্রারম্ভিক রীতি

ক্রুশের চিহ্ন ও প্রীতি সম্ভাষণ

ক্ষমানুষ্ঠান: যথারীতি

('হে প্রভু দয়া কর' বা 'হে প্রভু আমাদের দয়া কর' যদি গান করা হয় তবে সেই সময় জনগণের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করা যেতে পারে এবং জল সিঞ্চন শেষ অবধি গানটি চলমান থাকতে পারে।)

মহিমাস্তোত্র: জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয় *(গীতাবলী ২৪)* (সুশীল স্যারের সুর দেওয়া "জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয়" অথবা ফাদার প্যাট্রিক গমেজ-এর সুর দেওয়া "জয় পরমেশ্বরের উর্ধ্বলোকে জয়" গাওয়া যেতে পারে।

উদ্বোধন প্রার্থনা

শান্তির উৎস হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি ঐক্যবিধাতা, তুমি শান্তিদাতা! অনুনয় করি তোমায়: আমরা যেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে প্রয়োজনীয় সংলাপ এবং

যথাযথ শিক্ষা ও কর্মের দৃশ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে ও সকল মানুষের সামনে তোমার পুত্রের সত্য ও শান্তি-সম্প্রীতির সাক্ষী হয়ে উঠতে পারি। এই প্রার্থনা করি, পবিত্র আত্মার সংযোগে, তোমার সঙ্গে, হে পিতা, জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর-রূপে যিনি যুগে যুগে বিরাজমান, তোমার পুত্র শান্তিরাজ প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

খ. ঐশবাণী উপাসনা

১ম পাঠ: *ইসাইয়া ৩২: ১৫-১৮, ২০ (বাণীবিতান ১ম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড : বিবিধ, পৃষ্ঠা ৯৪৯)*

ধুয়োসহ সামসঙ্গীত : সামসঙ্গীত ৮৫: ৮কখ, ৯-১৩

ধুয়ো : ভগবানের ভক্তজন যারা, তিনি তাদের শোনান শান্তির বাণী!

২য় পাঠ: *কলসীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র ৩:১২-১৫*

খ্রিস্টবাণী-বন্দনা :

জয় জয়, প্রভুর জয়!

খ্রিস্টশান্তি বিরাজিত হোক তোমাদের অন্তরে; এমনই শান্তি লাভের জন্যে আহূত হয়েছ তোমরা!

একই খ্রিস্টের আপন অঙ্গ-রূপে!

জয় জয়, প্রভুর জয়!

মঙ্গলসমাচার : *যোহন ১৪:২৩-২৯*

অথবা

খ্রিস্টবাণী-বন্দনা :

জয় জয়, প্রভুর জয়!

ধন্য তারা, এ জগতে শান্তি আনে যারা;

ঈশ্বর-সন্তান ব'লে গণ্য হবে তারা!

জয় জয়, প্রভুর জয় !

মঙ্গলসমাচার মথি ৫:১-১২ক

উপদেশ (শুধু পয়েন্ট)

- **শান্তি:** শুধুই একটি ধারণা বা প্রেরণা নয়; শান্তি প্রথমে মন ও মানসিকতার ব্যাপার। শান্তিপ্রিয় মানুষ নিয়ন্ত্রিত মানুষ; শান্তিপ্রিয়তা প্রকাশ পায় মনোভাবে যা প্রকাশ পায় কথা-কাজ-আচরণে। অন্যের সাথে সম্পর্ক বন্ধনে। মনোভাব যখন শান্তিপ্রিয় হয়, তখন পরস্পরের সাথে কথোপকথন তথা পারস্পরিক সংলাপ সহজ হয়ে ওঠে; আর সংলাপের ফল শান্তি-সম্প্রীতি। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে সংলাপ।
- **নিত্যস্থায়ী শান্তি:** নিত্যস্থায়ী শান্তি বা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি বিনির্মাণের জন্য পোপ মহোদয় ১ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে তাঁর বাণীতে তিনটি পথ উল্লেখ করেছেন: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে সংলাপ; শিক্ষা ও কাজ। বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে; ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলছে বর্তমান প্রজন্ম। এই বর্তমান-ভবিষ্যতৎ প্রবীণ ও যুবা, এর মধ্যে বিভাজন হবে না যদি বাস্তবধর্মী সংলাপ হয়। এই দুইয়ের মধ্যে হবে সময় ও যুগলক্ষণভিত্তিক সংলাপ; জীবনকেন্দ্রিক সংলাপ; এই সংলাপে আরো থাকবে কৃষ্টিসংস্কৃতি এবং আরো। এই সংলাপে কেন্দ্রিয় প্রয়োজনটি হল শ্রবণ। পারস্পরিক শ্রবণ দিয়েই পারস্পরিক জ্ঞান অর্জন। তাই শান্তি বিনির্মাণের আরো একটি হাতিয়ার হল পড়াশুনা। এভাবেই দেখা যাবে যে, শান্তি স্থাপন করার এই দায়িত্ব প্রত্যেকেরই উপর বর্তায়। সংলাপ দাবী করে দুই পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা। দাবি করে একে অন্যকে শ্রবণ; অন্তর দিয়ে শ্রবণ।
- **শিক্ষা:** শিক্ষার উপর অর্থব্যয় বাঞ্ছনীয়। শুধু পুঁথিগত স্কুল কলেজের শিক্ষা নয়, বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির উপর শিক্ষা প্রয়োজন। বিশেষভাবে যুবসমাজকে শিক্ষা নিতে হয় প্রবীণদের কাছ থেকে; এবং প্রবীণকেও প্রশংসা করতে হয়, অনুপ্রাণিত করতে হয় বর্তমান প্রগতিকে। এমন শিক্ষা যতই মান সম্মত ও জীবন-ভিত্তিক, ততই শান্তির স্থায়িত্ব হবে প্রসার ও প্রগাঢ়।
- **কর্ম:** সংলাপ ও শিক্ষার পরপরই শান্তি বিনির্মাণের জন্য এখন প্রয়োজন কাজ। কর্ম হল প্রতিটি সমাজের মধে সম্প্রীতি ও ন্যায্যতা গঠনের ভিত্তিমূল। কর্ম হল পৃথিবীতে মানব জীবনের একটি অংশ; বেড়ে উঠার একটি পথ; মানব উন্নয়নের একটি ধারা। এই ধারণাই আমাদেরকে সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করতে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, কর্ম অর্থই আমার মেধা, শক্তি-সামর্থ, প্রতিভা সাধারণ মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা। কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কাজ; আমাদের সবার ধরিত্রি এই বিশ্বসৃষ্টিকে যত্ন করার ও রক্ষা করার কাজ; বিভিন্ন পর্যায় ও ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনের কাজ;: সামাজিক ন্যায্যতা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম , মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম; তবেই তো স্থায়ী শান্তি ।

- কোভিড ১৯ এর সময় পারস্পরিক শান্তি সম্প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে করোনা-সেবা দিয়ে। এক সর্বজনীন শান্তি-সম্প্রীতির মনোভাব নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল স্বাস্থ্য-সেবা দেবার জন্য সবাই। যখন শুধু মুখে নয়, উপদেশে নয়, লেখনীতে নয় , শান্তি প্রকাশ পাচ্ছে কাজে-কর্মে, তখনই শান্তি হয় নিত্যস্থায়ী, টেকসই। এমন নিত্যস্থায়ী শান্তি আজ খুবই প্রয়োজন।

বিশ্বাসমন্ত্র : পুনরুত্থানকাল এবং বিশেষ দিবস; তাই 'প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র' প্রার্থনটি সকলে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারে।

সর্বজনীন প্রার্থনা

১। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের ১ জানুয়ারির শান্তি দিবসের বার্তা অনুযায়ী এই সম্প্রীতি দিবসে প্রার্থনা করি, পৃথিবীর সকল মানুষ যেন দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামনে রেখে সংলাপে নিয়োজিত হয়, আসুন আমরা এই উদ্দেশে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।

২। প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে যেন চিন্তা ও ধারণার বিনিময় সাধন হয়; পরস্পরের মধ্যে যেন ভাবের আদান প্রদান হয় এবং পরস্পরকে শ্রদ্ধাপূর্ণ শ্রবণের মধ্য দিয়ে গ্রহণীয় মনোভাব নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, আসুন আমরা উভয় প্রজন্মের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।

৩। আমরা যেন বিশ্বাসের দৃষ্টিতে বর্তমান কালের যুগলক্ষণগুলোকে প্রত্যক্ষ করি এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় শান্তি-সম্প্রীতির মিলন-বন্ধনে জীবন পরিচালনা করি, আসুন আমরা এই উদ্দেশে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।

৪। আমাদের যুব সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা করি ঃ বর্তমানের এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে তারা যেন যা-কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করতে ও যা-কিছু ধংসাত্মক তা বর্জন করতে প্রস্তুত থাকে; আসুন আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।

৪। আপন আপন বাস্তবতায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বর যেন আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি ও অনুগ্রহ দান করেন, আসুন আমরা এই উদ্দেশে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।

৫। প্রতিটি পরিবার ও সমাজ যেন শান্তি, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এবং ঐক্যের তৃণভূমি হয়ে উঠে, আসুন আমরা এই উদ্দেশে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি।

উত্তর : হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।

৬। অন্যান্য অনুনয় প্রার্থনা নীরবে

পৌরহিত্যকারী : হে প্রভু, বিশ্বাস ও আশা নিয়ে যে-সকল উদ্দেশ্য-প্রার্থনা তোমার চরণে নিবেদন করলাম, তা তুমি সদয় হয়ে গ্রহণ কর ও পুর্ণ কর। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে। আমেন।

গ. ধন্যবাদ-যজ্ঞের উপাসনা

অর্পণ গীতি: অর্ঘডালা, সাজিয়ে এনেছি (গীতাবলী ১৫৬)

যিশুর রক্তমাংস সত্য (গীতাবলী ১২৭)

অর্ঘ শোভাযাত্রা : *(নির্দিষ্ট কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত একে এক সাজানো রুটির পাত্র, পানপাত্র, দ্রাক্ষারস-জল পাত্র, সম্প্রীতির চিহ্নস্বরূপ উপরের লগোটি কার্ডে এঁকে তা যাজকের হাতে তুলে দিতে পারে।)*

হে পরমেশ্বর, সংলাপ, শিক্ষা ও কর্মসাধনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে তুমি তোমার ভক্তজনগণকে অনুপ্রাণিত করে থাক। আমাদের সামনে তুমি এই আশা তুলে ধরেছ যে, আমরা তোমার কাছ থেকে তোমার রেখে যাওয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শক্তি পেতে পারব। তাই তোমাকে মিনতি জানাই : আজ তোমার চরণে এই যে-খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করতে চলেছি, তার মাহাত্ম্যে যেন

আকাঙ্ক্ষিত সেই দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংলাপ, শিক্ষা ও কর্মসাধনে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি। এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে। আমেন।

ধন্যবাদিকা-স্তুতি : পঞ্চাশত্তমী অথবা পবিত্র ত্রিত্বের রবিবারের বন্দনা ('প্রভুর স্মরণোৎসব' বই দেখুন)

পুণ্যগীতি : পুণ্য পুণ্য পুণ্য প্রভু, পুণ্য তুমি

খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা ২ ('প্রভুর স্মরণোৎসব' বই দেখুন)

ঘ. পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ রীতি

- **প্রভুর প্রার্থনা** : পরস্পরের হাত ধরে উচ্চস্বরে প্রার্থনাটি বলা যায় বা গান করা যায়।
- **শান্তি বিনিময়** : দু'হাত জোড় করে ঈষৎ মাথা নত করে পরস্পর শান্তি বিনিময় করা যেতে পারে।
- **রুটি-খণ্ডন** : হে বিশ্ব পাপহর, ঈশ্বরের মেষশাবক .....

প্রসাদ-গীতি : (১) শান্তি যেখানে, সেখানে আমি তো আছি (গীতাবলী ২২২)

(২) শান্তির চিরসঙ্গী হে মোর (গীতাবলী ১৯৭)

(৩) আমায় তুমি শান্তির দূত কর ((গীতাবলী ২২০)

খ্রিস্টপ্রসাদ পরবর্তী প্রার্থনা

হে পরম পিতা, আমাদের শান্তিরাজ যিশুখ্রিস্টের পরম প্রসাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা তোমাকে অনুনয় করি: আমাদের মন-প্রাণ এমন মানবপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত কর, যাতে আমরা সারা জগতে সংলাপ, শিক্ষা ও কাজের মধ্য দিয়ে সেই শান্তি ছড়িয়ে দিতে পারি , যে-শান্তি তোমার পুত্র যিশু নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। বিশ্বপ্রভু-রূপে তিনি যে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

ঙ. সমাপন রীতি

বিদায়ী মহা-আশীর্বাদ ('প্রভুর স্মরণোৎসব' বই দেখুন। পুনরুত্থান কালের আশীর্বাদ)

পৌরহিত্যকারী : যাও, জগতে ঘোষণা কর, প্রতিষ্ঠা কর প্রভুর নিত্যস্থায়ী শান্তি।

সকলে : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

সমাপন গীতি :

(১) ধর লওরে ঈশ্বরের প্রেম, যিশু ডাকেন আয় (গীতাবলী ৮৩৭)

(২) প্রেম যে চির মধুর (গীতাবলী ২৩৭)

(৩) হাতে হাতে হাত ধ'রে চল্‌রে (গীতাবলী ২৬৬)

বি.দ্রঃ

(১) সম্প্রীতি দিবসটি এ বছর ১০ জুন শুক্রবারে পালন করতে না পারলে সুবিধা অনুসারে অন্য যে-কোন দিনও করা যেতে পারে।

(২) পরিস্থিতি অনুকূল হলে খ্রিস্টযাগের পর পরই বাইরে এসে উপাসকমণ্ডলী বিশেষ চিহ্ন দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে শান্তি, মিলন ও একতা প্রকাশ করতে পারে। মিষ্টি বিতরণ করতে পারে। একত্রে আহারের ব্যবস্থাও করতে পারে।

(৩) খ্রিস্টযাগের পর পরই অথবা অন্য উপযুক্ত যে-কোন দিন এই বছরের মূলসুরকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে সেমিনার/আলোচনা সভা করা যেতে পারে। আবার এই মূলসুর নিয়ে আন্তঃধর্মীয় বা আন্তঃমাণ্ডলিক সেমিনার, গোল টেবিল বৈঠক বা আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে॥

সংলাপের মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়

সিস্টার সবিতা কস্তা সিআইসি

বাংলাদেশ একটি শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও কৃষ্টির ভাই-বোনেরা শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে দিনের পর দিন এক সুদূর প্রসারী ঐতিহ্য গড়ে তুলছে। এ দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মমতের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে তারা শান্তি, সম্প্রীতি ও ন্যায্যতার স্বপক্ষে নানা উদ্যোগের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও গোষ্ঠীর জনগণ একসাথে একই মহল্লায় মিলেমিশে অতি প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছি। তবুও মানুষ হিসাবে সর্বোপরি একই দেশের অধিবাসি হিসাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক অনেক মিল, আবার রয়েছে অনেক বিচ্ছিন্নতা ও অনেক অমিল। যেমন রয়েছে মনোমালিন্য, দলাদলি, রেষারেষী, কোন্দল, রাহাজানি, মারামারি ও জীবন হানাহানি। আরও রয়েছে হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি। তারপরেও মানুষ হিসাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মিল।

তবে প্রত্যেক ধর্মই শান্তি, সত্য, সুন্দর, পবিত্রতায় ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করে। প্রত্যেক ধর্মই মানুষের কল্যাণ সাধন, দয়া-মায়া, মমতা ও সেবা কাজ করার উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকে। মানব কল্যাণে এগিয়েও আসে। অন্যের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করে দুঃখ-কষ্টের সাথী হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জাগতিক ভাবে অনেক অনেক উন্নতি সাধন করছে তবে পরিতাপের বিষয় হলো যে, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে এখনও সে সকল দেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অন্যায়, অন্যায্য, অশান্তি, অসত্য দুর্নীতি মারামারি কাটাকাটি ও হানাহানি উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এই অবস্থার উত্তরণের জন্য ধর্মগুলোর বেশ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম একত্রিত হয়ে যখন একমন একপ্রাণ হয়ে কাজ করবে তখনই মাত্র সম্ভব হবে একে অন্যের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা। বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসাথে আসছে, বসছে, উৎসব করছে, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করছে, খাওয়া-দাওয়া করছে, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে একসাথে ওঠা-বসা করছে একে অন্যের আনন্দ ভাগাভাগী করে নিচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ, রাজনৈতিক, অর্থনেতিক বিভিন্ন কারণে বর্তমানে মানুষ অতি সহজেই মানুষের নিকটে আসছে। নিকটে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধও করছে। তারা যেন আত্মায় এক ও অভিন্ন আত্মার আত্মীয়। তারা যেন সকলে একই আত্মার আত্মীয়স্বরূপ। আসলে মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে একা একা বা বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ বেঁচে থাকতে পারেনা। পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা না থাকলে বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকা দায়। তাই দেখা যাচ্ছে মানব কল্যাণের উদ্দেশে বর্তমানে অনেক সংস্থা, সংগঠন, যৌথভাবে গড়ে উঠছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতায়ও একই সাথে ধ্যান, প্রার্থনা এবং পারস্পরিক ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বিনিময়ও হচ্ছে। সংলাপের মাধ্যমেই তা সম্ভব হচ্ছে। ধর্মের সীমানা পেরিয়ে এখন সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য ধর্মের মানুষের সংস্পর্শে এসে তারা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস, অনুশাসন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আরও গভীরতা, সত্যতা ও স্পষ্টতা অনুভব করতে পারছে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ফলে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ধর্মগুলোরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এক ধর্ম অন্য ধর্মের কাছে প্রমাণ করছে যে, খাঁটি ধর্মে কোন সহিংসতার স্থান নাই। একই সৃষ্টিকর্তা সবাইকে দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টির্কতার সৃষ্টি বলে আমরা একে অন্যের ভাই-বোন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আসল কথা ও সর্বশেষ যুক্তি হচ্ছে একতা ও মানব জাতির ঐক্য। মানব জাতির একের জন্য সবাইকে একযোগে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে এবং নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে এবং অভিন্ন চিন্তা চেতনার বিষয় নিয়ে এক সাথে কাজ করতে হবে। তবেই আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হবে॥

সংলাপ হলো নিত্যস্থায়ী শান্তির ব্যাকরণ

ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও

শুভারম্ভ: "কত না সুন্দর পর্বতের উপরে তারই চরণ- যে শুভসংবাদ, শান্তি প্রচার করেন" *(ইসাইয়া ৫২:৭)*। প্রজন্মপরিক্রমায় শিক্ষা, কর্ম ও সংলাপ হলো স্থায়ী শান্তি স্থাপনের হাতিয়ারসমূহ। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হলো শান্তি প্রচার, যা হবে ক্ষয়ে যাওয়া ইতিহাস থেকে পুর্ণজন্মলাভের অঙ্গীকার। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- অস্ত্র নয়, যুদ্ধ নয়, বিদ্বেষ নয়, বিভেদ নয়, "সংলাপই হলো সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র," এবং "যুদ্ধের কোনো হৃদয় নেই।"

বর্তমানের আর্তনাদ: আধুনিক সভ্যতার যুগে সংগঠিত এবং ফলপ্রসু সংলাপ উদ্যোগের অভাবে যুদ্ধের মনোভাব ও সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছে। মহামারির মতো সংক্রমণ বাড়ছে- ফলে আবহাওয়া বিপর্যয় ও পরিবেশ বিনাশ আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে- সেই সঙ্গে ক্ষুধা-তৃষ্ণার সংকট বাড়ছে, অর্থনৈতিক আদল সবার জন্য না হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে, তাতে করে গরিবের ক্রন্দন এবং ধরিত্রীর ক্রন্দন, ন্যায় ও শান্তি স্থাপনকে কঠিন করে তুলছে। সব সময়ের জন্যই শান্তি হলো উপহার- যা, উপর থেকে আসে এবং তা একটা সমন্বিত প্রচেষ্টা। শান্তির নক্শা হলো একটা শিল্প- যেখানে সবার অংশগ্রহণ থাকে এবং সবাই নির্ভরশীল থাকে। একটা শান্তিময় বিশ্ব গড়ার উদ্যোগ শুরু হয় ব্যক্তির আত্মা থেকে, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, যা মানুষ এবং জাতির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। যেমন আমরা এই মহামারির সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উদাহরণ দেখছি।

নিত্যস্থায়ী শান্তি: সংলাপ-শিক্ষা-কর্ম-শ্রবণ

সংলাপ: সংলাপ হলো একে অন্যকে শোনা, মতবিনিময় এবং একসঙ্গে চলার অঙ্গীকার। এরূপ সংলাপ স্থাপন ক'রে বংশপরিক্রমায় চলে আসা শত্রু ও বিবাদের অনুর্বর মাটি ভেঙ্গে স্থায়ী শান্তির বীজ বপন করা সম্ভব। সংলাপে অন্যকে প্রভাবিত না ক'রে সবাইকে একে অন্যের জন্য অবস্থান তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংকট থেকে আমাদের অভিজ্ঞতা পরিষ্কার যে, সুস্থ রাজনীতির পিছনে পরিচালনা ব্যাকরণিক শক্তি হলো সংলাপ। এই সংলাপের শক্তি নির্মিত হয় অতীতে তাকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে প্রবেশ করার মধ্যদিয়ে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হলে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে যেনো ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে আশায় পরিস্ফুটিত হতে পারি। একসঙ্গে আমরা একে অন্যের থেকে শিখতে পারি। শিকড় ছাড়া কীভাবে বৃক্ষ ফলদানের জন্য বেড়ে উঠতে পারে?

শিক্ষা ও শ্রম: শিক্ষা হলো প্রজন্মপরিক্রমায় সংলাপের ব্যাকরণ এবং নারী-পুরুষের শ্রম হলো সবার মঙ্গলের জন্য সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর শান্তি দিবসের বাণীতে বলেছেন, "শান্তি স্থাপন এবং শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রম একটি অপরিহার্য খাত। শ্রম হলো নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত উপহার এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যয়, আত্ম-বিনিয়োগ এবং অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি- কারণ আমরা সব সময় কাজ করি অন্যের সঙ্গে এবং অন্যের জন্যে। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে- কর্মক্ষেত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, সুযোগ করে দেয় বিশ্বকে আরো সুন্দর করার জন্য। শ্রম ক্ষেত্র হলো শান্তির তরে সংলাপ-সম্প্রীতি অনুশীলনের একটি উপযুক্ত স্থান।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস:

- পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "আমাদের কাছে রয়েছে ঈশ্বরের দেওয়া সবচেয়ে বড় এবং কার্যকর ভ্যাকসিন, আর তা হলো- আশা নিয়ে প্রার্থনা এবং প্রৈরিতিক কাজের প্রতি বিশ্বস্থতা।" ঈশ্বরের দেওয়া দান- শক্তিশালী ভ্যাকসিন সম্পর্কে তিনি বলেন, "এর দ্বারা আমাদের শক্তিকে নবায়ন করতে পারি, যেনো ঈশ্বরের রাজ্যে পবিত্রতার, ন্যায্যতার এবং শান্তির দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারি।"
- পোপ মহোদয় খ্রিস্টধর্মের নেতাদের উদ্দেশে আরো বলেন- "পুনর্মিলন এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য বীজ বপন করতে হবে- যেনো সবাইকে আশায় পুনর্জন্ম হওয়ার দিকে চালিত করতে পারে।" তিনি বলেন, "খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদের শিক্ষা দেয়- ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা ও প্রতিযোগিতা দূরে ফেলে একটা সর্বজনীন ঐক্য স্থাপন করা- যাতে অন্যকে গ্রহণের মধ্যদিয়ে ভাই-বোনের বন্ধন গড়ে তুলতে পারি।" পোপ আরো বলেন, "বৈরী স্বভাব, চরমপন্থা এবং বিবাদ ধর্ম অনুসারিদের আত্মায় জন্ম নিতে পারে না- সেটা হলে হবে বিশ্বাসঘাতকতা।" কখনো শান্তি ফিরে আসবে না- যদি এক ধর্মের মানুষ ভিন্ন ধর্মের মানুষকে 'অন্য' হিসেবে দেখে। তিনি বলেন, "কারা হারলো আর কারা জিতলো, এটা শান্তির দাবী নয়- কিন্তু আসল সত্য হলো সবাই ভাই-বোন।" এই প্রসঙ্গে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "চিড়ধরা ও বিভাজিত বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মধ্যদিয়ে স্বাক্ষ্যদান কতোই না জরুরি- তাই আমাদের প্রতিটি চেষ্টাই হতে হবে- প্রাবক্তিক ভূমিকা গ্রহণ করা। "ঈশ্বরের আরাধনা এবং প্রতিবেশিকে ভালোবাসা হলো ধর্মের সারকথা, সত্যতা" এবং যার অন্তরালে বিরাজ করে সংলাপ।
- পোপ ফ্রান্সিস গত বছর তাঁর এক বাণীতে বলেছিলেন "এসো দেখে যাও" যেনো মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা আবিষ্কার করতে পারো। সেই ধারা অব্যাহত রেখে তিনি এবার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন "শ্রবণ" ধ্বনির দিকে, যা যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাকরণসরূপ ও উপযুক্ত সংলাপের একটি শর্ত।

শ্রবণ বড়ই প্রয়োজন

বস্তুতপক্ষে আমাদের মুখোমুখি রয়েছেন যারা, তাদের "শ্রবণ" করার সামর্থ আমরা হারাচ্ছি- হারাচ্ছি দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন সম্পর্কে এবং হারাচ্ছি নাগরিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আলাপচারিতায়। অন্যদিকে একই সময়ে যোগাযোগ ও তথ্য পরিবেশনার বিভিন্ন মাধ্যম নতুনতায় উন্নত হচ্ছে ও নিশ্চিত করছে যে, "শ্রবণ" করা মানব জীবনে এখনো একটি প্রয়োজনীয় জায়গা। একজন সম্মানিত চিকিৎসকের দায়িত্ব ক্ষত নিরাময় করা এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, মানুষের জীবনে বড় প্রয়োজন কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "শ্রবণ করার সীমাহীন ইচ্ছা।" ইচ্ছা অনেক সময় গোপনই থাকে কিন্তু তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ- যারা শিক্ষক, গঠনদানকারি বা অন্যভাবে যোগাযোগ ভূমিকা রাখেন- যেমন, পিতামাতা-শিক্ষক, পালক-পালকীয় কর্মী, পেশাদারি যোগাযোগ কর্মী এবং যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সেবা দান করেন।

- শ্রবণ: সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস তাঁর এক বাণীতে বলেছেন, "হৃদয়ের কানদিয়ে শ্রবণ করো।" এখানে "শ্রবণ" মানে শুধু ধ্বনি উপলব্ধি নয়- কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বর ও মানব জীবনের মধ্যে একটি সংলাপীয়

সম্পর্ক রচনা। পবিত্র বাইবেলের আইন গ্রন্থে ঈশ্বরের প্রথম নির্দেশ ছিলো, "হে ইস্রায়েল, শোনো *(২য় বিবরণ ৬:৪)*," এই ব্যাপারে সাধু পল নিশ্চিত ক'রে বলেন, "বিশ্বাস আসে শ্রবণেই *(রোমীয় ১০:১৭)*।" বাস্তবিকভাবে ঈশ্বরই উদ্যোগ নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে উত্তর দিই "শ্রবণ" ক'রে। এই "শ্রবণ" আসে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে- যেমন সদ্যজাত শিশু তার পিতা মাতার কণ্ঠ শুনে অনুমান করে।

- শ্রবণ: "শ্রবণ" ঈশ্বরের মহানুভবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা হলো কর্মোদ্যোগ যার মধ্যদিয়ে ঈশ্বর নিজেকে একজন বক্তা, তাঁর সাদৃশ্যে নারী-পুরুষ সৃষ্টি এবং তাদের "শ্রবণ" ক'রে নিজের সঙ্গে সংলাপের অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ঈশ্বর মানবতাকে ভালোবাসেন এবং সেই কারণে তিনি তাঁর বাণীতে তাদের সম্বোধন করেন এবং তাদের শোনার জন্যে "তাঁর কর্ণ অবনত" করেন। ঈশ্বর সর্বদা স্বাধীনভাবে যোগাযোগ ক'রে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং নারী-পুরুষকে অনুরোধ করেন- শোনার জন্য আগ্রহী হ'তে। সদাপ্রভু পরিপূর্ণভাবে মানুষকে আহ্বান করেন তাঁর ভালোবাসার সন্ধি হওয়ার জন্য, যেনো তারা যা, তা পূর্ণভাবে হয়ে উঠতে পারেন: যেমন তারা হয় ঈশ্বরের সদৃশ্য, শোনার সামর্থ, অভিনন্দন জানানো, অন্যকে স্থান দেওয়া ও মৌলিকভাবে ভালোবাসার আশ্রয়ে একটি শ্রবণেন্দ্রিয়।

  সেই কারণে যিশু তাঁর শিষ্যদের শ্রবণমান মূল্যায়ন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "তাই তোমরা যে এখন কীভাবে এইসব কথা শুনছো, সেই বিষয়ে সাবধান থেকো *(লুক ৮:১৮)*।" বীজ বুনিয়ের উপমা কাহিনী শেষে তিনি শিষ্যদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র শোনাই যথেষ্ট নয়- কিন্তু শুনতে হবে নির্ভুলভাবে। আর যারা "সৎ উদার প্রাণে" বাণী শু'নে তা আঁকড়ে ধরে রাখে তারা নিজেদের কর্তব্য-নিষ্ঠায় ফলশালী হয়ে ওঠে *(লুক ৮:১৫)*।

- সংলাপ ও শ্রবণ: উত্তম সংলাপের একটা বড় পদ্ধতি হলো শ্রবণ করা। আমাদের প্রত্যেকের শ্রবণেন্দ্রিয় রয়েছে এবং তা দিয়ে উপযুক্তভাবে শোনার সক্ষমতা থাকলেও অনেক সময় অন্যকে শুনতে ব্যর্থ হই। বাস্তবে, আমাদের অন্তরের বধিরতা শারীরিক বধিরতার চেয়ে অধিকতর অসুস্থ। প্রকৃতপক্ষে "শ্রবণ" হলো গোটা ব্যক্তিব্যাপী উপলব্ধি- শুধুমাত্র শোনা নয়। উত্তম শ্রবণের উত্তম আসন হলো হৃদয়। সাধু আগস্টিন অনুপ্রাণিত করতেন হৃদয় দিয়ে, হৃদয়ের আধ্যাত্মিকতা দিয়ে শোনার জন্যে- শ্রবণ বাহ্যিক কান দিয়ে নয়। তিনি বলেছেন, "তোমার কানের মধ্যে হৃদয় রেখো না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে তোমার কান রেখো।" আসিসির সাধু ফ্রান্সিসও তাঁর সহকারিদের বলতেন, "তোমার হৃদয়ের শ্রবণেন্দ্রিয় উন্মুক্ত করো।" সুতরাং যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রবণের প্রথম আবিষ্কার হলো- অন্যের আত্মাকে এবং অন্যের প্রয়োজনকে শোনা- যেখানে ব্যক্তির অন্তরাত্মা বিরাজ করছে। আমরা 'অনু' হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আহূত নই- 'একসঙ্গে' বেঁচে থাকার জন্যে।

- **সংলাপ ও যোগাযোগ:** সুচিন্তিত ও সুস্থ যোগাযোগ হলো মানবিকভাবে সামনা-সামনি, মুখোমুখি শোনা এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয় তাদের সুহৃদভাবে, বিশ্বস্তভাবে এবং সৎ ও খোলাখুলিভাবে গ্রহণ করা। আমরা প্রতিদিন যে না শোনার অভিজ্ঞতা করি, দুঃখজনকভাবে নাগরিক জীবনেও যা স্পষ্ট- তা হলো অন্যকে শোনার পরিবর্তে "একে অন্যের অতীত নিয়ে কথা বলি।" উত্তম যোগাযোগ-সংলাপ কোনো সময় শব্দ-ধ্বনি দিয়ে মানুষকে অভিভূত করতে চায় না, কিন্তু অন্যের কারণসমূহের দিকে নজর দেয় এবং বাস্তবতার মধ্যে যে জটিলতা বিদ্যমান তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। বাস্তবে, অনেক ক্ষেত্রে সংলাপে আমরা আদৌ যোগাযোগ স্থাপন করি না। আমরা মাত্র অপেক্ষা করি অন্যে কখন তার বক্তব্য শেষ করবে যেনো আমরা আমাদের মতাদর্শ পেশ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক আব্রাহাম কাপলান বলেছেন, "সংলাপ হলো কথোপকথন: একলাপ নাটকে দ্বৈত কণ্ঠ।" সত্যিকার যোগাযোগ হলো- "আমি" এবং "তুমি" একে অন্যের কাছ থেকে দূরে রাখা।

সমাপনী শিক্ষাবাণী

১) সুতরাং শোনা হলো সংলাপ ও উত্তম যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য উপকরণ। যোগাযোগ-সংলাপ কখনো স্থান করে নিতে পারে না- যদি সেখানে ভালোভাবে শোনার অবসর না থাকে। উপযুক্ত, ভারসাম্য এবং তথ্যসমৃদ্ধের জন্য বর্ধিত সময় নিয়ে শোনা প্রয়োজন। একলাপ দূরে সরিয়ে একমাত্র বহুকণ্ঠ দ্বারাই সত্যিকার যোগাযোগ-সংলাপ স্থাপন সম্ভব। বিভিন্ন কণ্ঠ থেকে শোনা, একে অন্যকে শোনা হলো একটি শিল্পের অনুশীলন যা আমাদের সামর্থকে প্রকাশ ক'রে ঐক্যতানসঙ্গীত রচনা করে।

২) কথোপকথন একটি শক্তমাথার দলের সঙ্গে খুবই কঠিনযোগ্য কাজ- যার মধ্যদিয়ে ন্যূনতম ভালো ও স্বাধীন চেতনা অর্জন করা যায় না। তবুও মনে রাখতে হবে- শ্রবণ করার জন্য সহিষ্ণুতার গুণ থাকা প্রয়োজন। বিস্ময়ানন্দের মধ্যদিয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব- যেমন একটি শিশু অসীম বিস্ময় নিয়ে প্রসারিত চোখে তার চারিদিকের বিশ্বকে দেখে। ঠিক মনের এই কাঠামো নিয়ে, শিশুর চোখের এই বিস্ময় নিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে শিক্ষালাভ ক'রে সচেতন ও সমৃদ্ধশালী হয়ে নিজের ও অন্যের জীবনকে ফলদায়ী করে তুলতে পরেন।

৩) শ্রবণ আজ মণ্ডলীর ভীষণ প্রয়োজন: মণ্ডলীতেও অতি প্রয়োজন রয়েছে শোনা এবং একে অন্যকে শোনার। আমরা অন্যের জন্য মূল্যবান ও জীবনভিত্তিক দান অর্পণ করতে পারি। খ্রিস্টভক্তদের ভুলতে হবে না যে, এই শ্রবণীয় পালকীয় কাজ তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন এমন একজন, যিনি প্রকৃত শ্রবণকারি যেনো তারা অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করতে পারেন। আমাদের শুনতে হবে ঈশ্বরের শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে এবং তাঁর কণ্ঠ দিয়ে কথা বলতে হবে। প্রটেস্টান্ট ঐশতত্ত্ববিদ দিয়েট্রিস বনহোফার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন যে, "অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের প্রথম করণীয় হলো তাদের "শ্রবণ" করা। যে ব্যক্তি তার ভাই-বোনকে শুনতে শিখেনি, অচিরেই সে ঈশ্বরকে না শোনার সামর্থ অর্জন করবে।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পালকীয় কর্মকাণ্ড হলো "শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রৈরিতিক কাজ।" বলার আগে শুনতে হবে- যেমনটি বলেছেন সাধু যাকব তাঁর ধর্মপত্রে, "শুনতে সবাই আগ্রহী থাকুক, কিন্তু কেউ যেনো সহজে মুখ না খোলে (১:১৯)।" স্বাধীন ইচ্ছায় অন্যকে শোনার জন্য কিছু সময় বরাদ্দ করা হলো ভালোবাসার প্রথম কাজ।

৪) **সিনোডাল চার্চ ও শ্রবণ:** মণ্ডলীতে এখন সিনোডাল চার্চ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আসুন প্রার্থনা করি যেনো এই মহাসুযোগ হয়ে ওঠে- "একে অন্যকে শোনা" এবং "আত্মায় আত্মায় শ্রবণ।" সম্পর্কটা পদ্ধতিগত বা আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়- কিন্তু নির্মিত হয়ে ওঠে ভাই-বোনদের মধ্যে পারস্পরিক শোনার মধ্যদিয়ে। একটি সঙ্গীতদলে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠ একসঙ্গে মিলে তৈরি হয় বহু কণ্ঠনির্ভর একটি গীত। একই সময়ে, সঙ্গীতদলের প্রতিটি কণ্ঠ অন্য কণ্ঠগুলোর সঙ্গে মিলে থেকে একটা পুরো সমন্বিত সঙ্গীত হয়ে ওঠে। সুরের এই ঐক্যতান তৈরি করে একজন পরিচালক আর সমন্বিত সঙ্গীত হয়ে ওঠে প্রত্যেকের ও সবার আলাদা আলাদা কণ্ঠস্বরে। এই উপলব্ধিটা আমলে নিয়ে আমরা নিজেদের জড়িত করবো অংশগ্রহণে যেনো আমরা নিজ নিজ ও ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে গাইতে পারি এবং একে অন্যের কণ্ঠধ্বনিকে একটি দান হিসেবে স্বাগত জানিয়ে পবিত্র-আত্মার তৈরি সুরে হয়ে ওঠতে পারি একটা সমবেত-সমন্বিত সঙ্গীত।

শেষ কথা: ৬ষ্ঠ পোপ বলেছিলেন, "শান্তি আপনার উপরও নির্ভর করে।" প্রতিটি ব্যক্তি এক একটি শান্তির পায়রা। সংলাপের মধ্যদিয়ে ব্যক্তির সহনশীলতা ও ভালোবাসা প্রকাশ- বিভাজন নির্মূল করতে পারে। কারণ, "সংলাপ হলো নিত্যস্থায়ী শান্তির ব্যাকরণ॥" □

বিশ্ব শান্তি দিবসে পোপীয় আবাহন প্রেক্ষিতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও স্থায়ী শান্তি-বিনির্মাণ শিক্ষা

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

'জগৎ জুড়ে আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানবজাতি।' কিন্তু সে এক ও অভিন্ন মানবজাতির বিশ্বাস বা ধর্ম অনেক। অতি আধুনিক বিশ্বের জ্ঞাত ইতিহাসে জাতীয় এবং আন্তঃর্জাতিক সংঘাতের একটি অন্যতম হেতু হিসেবে প্রায়শ: ধর্মই দায়ী বলে বিবেচিত হয়। অনেক জ্ঞানী-গুণীজন, পণ্ডিত এ যুক্তি দিয়ে থাকেন যে বেশীর ভাগ সংঘাত-সংঘর্ষই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে বিশেষ ও ব্যাপকভাবে ধর্মের উপর ভিত্তি করেই উদ্ভূত বা পরিচালিত। 'শান্তির জন্যই ধর্ম' বহুল প্রচারিত শ্লোগানটি মিথ্যে হয়ে যায় শান্তিকামী আস্তিক-নাস্তিকের নানা অশান্তি-অরাজকতা আর সংঘাতের বাড়াবাড়ি আর ছড়াছড়িতে। যে কোন সংঘর্ষ বা বিবাদ বিচ্ছেদে সেই দোষী ধর্মসহ অন্যান্য সকল ধর্মের সুললিত বাণীই আবার হতে পারে পারস্পরিক বোঝাপড়া, পুনর্মিলন ও শান্তির অমূল্য ও অনন্য উৎস। এ ধর্মই যোগান দিতে পারে স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টার স্থায়ী ভিত্তি।

বর্তমান বিশ্বে খ্রিস্টীয় মতবাদ, সবচেয়ে বেশী অনুগামী-অনুসারী নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রিয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সুসংহত ও ধারাবাহিক। জগতের 'শান্তিরাজ' প্রভু যিশুখ্রিস্টের শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বারতা প্রচার ও ঘোষণা করে সবিশেষ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে মাদার চার্চ বা খ্রিস্ট দেহরূপ মণ্ডলী। কাথলিক চার্চের গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় ধর্ম উদ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রাধান্য পেয়েছে আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ, সর্ব ধর্ম সম্প্রীতি প্রচেষ্টা এবং শান্তি বিনির্মাণ। শতাব্দী ধরে চলে আসা অনেক কুসংস্কার, নূতনত্বহীন বাঁধা-ধরা বিষয়, এবং অবাস্তব-অতিকথা আমাদের স্বচ্ছ-সুন্দর মন ও অন্তরকে করেছে ঘন কালো অন্ধকার। জাতি ধর্ম বর্ণ বৈষম্য বিলীন সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও মানবিক সম্পর্ক উন্নয়ণ করতে সামনে আসে নানা রকম বাঁধা-বিঘ্ন, চ্যালেঞ্জ। তাই পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রে বোঝাপড়া বা সমঝোতা থেকে ভুল বুঝাবুঝি হয় অনেক বেশী।

আজকের জগতে সত্য থেকে মিথ্যা অপবাদ-কলঙ্ক উচ্চারিত বা প্রচারিত হয় অনেক বেশী। আজকের পৃথিবীতে বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা থেকে শত্রুতা ও হানাহানি সংঘটিত হয় অনেক বেশী। আজকের বিশ্বে ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক বিষয়গুলোই হয়ে গেছে সবচেয়ে বেশী সাধারণ বিষয়। আর এই পরিবর্তিত ও চলমান বিশ্ব মানব পরিবার পরিমণ্ডলে পুণ্য পরম পোপগণ সাহসী, আদর্শিক ও বাস্তব নির্দেশনায় নেতৃত্ব দেন প্রাবক্তিক প্রজ্ঞায় ও অতুলনীয় দুরদর্শিতায়।

আশার কথা এই যে, অপরের সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধার মত সঞ্জীবনীর জন্য ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, ধর্মীয় সংলাপ, সম্প্রীতি, শান্তি বিনির্মাণের জন্য চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত: মানব জাতির কল্যাণ ভাবনার পাশাপাশি সমগ্র সৃষ্টির মঙ্গল বিষয়টিও প্রধান কর্ম পরিকল্পনায় অঙ্গীভূত হয়ে আছে। আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ক্ষমতাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সকল ধর্ম সম্প্রদায়গুলোকে সহ-অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো ও শর্তাবলী সৃষ্টিতে ব্যবহার করা যায়।

সংলাপ ও শান্তি

পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের অন্তঃস্থল হলো সংলাপ, যা বিনির্মাণ করে শান্তি। শান্তি হচ্ছে মানুষের সীমাহীন চাওয়াগুলোর মাঝে সবচেয়ে যৌক্তিক এবং মূল্যবান চাওয়া। শান্তির গুরুত্ব ও প্রাপ্তি সবসময় কাম্য। অনেকেই মনে করেন, যে কোন ধরণের শান্তি, যে কোন প্রকারের সংঘাত, সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব তথা সহিংসতা থেকে উত্তম। কিন্তু, অনস্বীকার্য যে, শান্তির ধারণা সব মানুষের কাছে অর্থবহ সব পরিস্থিতিতে এক রকম থাকে না। কেউ কেউ শান্তিকে যে কোন ধরণের দৈহিক আঘাতের অনুপস্থিতি হিসেবে দেখিয়েছেন। আবার কোন কোন মনীষী দেখিয়েছেন যে, শান্তি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং বোঝাপড়ার এক অপূর্ব সম্মিলন। সংলাপ, সম্প্রীতি, শান্তি, শিক্ষা, শ্রম, মর্যাদা, ন্যায্যতা, একতা, ভ্রাতৃত্বের মত বিষয়গুলোও সময় প্রেক্ষিতে চার্চ নতুন করে সংজ্ঞায়িত, ব্যাখ্যায়িত বা বিশেষায়িত করেছেন। আর সে যুগলক্ষণের আয়না হয়ে আছে মহামান্য পোপদের সুচিন্তিত সর্বজনীন পত্রাবলী, ঘোষণাপত্র, ডকুমেন্টস্ প্রভৃতি।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বনাম শান্তি পলিটিকস্

জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ হানস্ কূঙ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং শান্তি রাজনীতির প্রতিচ্ছেদন নিয়ে সুদীর্ঘকাল অনুসন্ধান অভিযান করে যে মন্তব্যগুলো করেছিলেন সেগুলোই সংলাপের জন্য একটি প্রভাব বিস্তারকারী কাঠামো হিসেবে পরিচিতি ও প্রচার পেয়েছে। তিনি বলেছেন: সংলাপ ও শান্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়ে আছে দু'টি মৌলিক নীতির উপর। প্রথমটি হলো ব্যক্তির সত্যিকার বা আসল মন-মানসিকতা। দ্বিতীয়টি হলো বিশ্বধর্ম ঐতিহ্যের গোল্ডেন রুল বা সোনালী সূত্র: "তুমি অন্যের কাছ থেকে যা কিছু আশা কর, তুমি নিজেও অন্যের প্রতি তা করো"। এই দুটি মৌলিকনীতিই ভিত্তি হয়ে আছে বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মীয় ঐতিহ্যে। তিনি আরও বলেন যে, সকল মানবিকতার ঐতিহ্যগুলোর মধ্যে চারটি নৈতিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথমত: তুমি নরহত্যা, নির্যাতন, উৎপীড়ন বা ক্ষতবিক্ষত করবে না। ইতিবাচক শব্দমালায় তা এভাবেই বিবৃত: জীবনের জন্য সম্মান-শ্রদ্ধা নিবেদন কর; অহিংসা ও জীবনের জন্য পবিত্র শ্রদ্ধার কৃষ্টিতে নিষ্ঠ থাক।

দ্বিতীয়ত: তুমি মিথ্যা, প্রতারনা, জালিয়াতি ও পক্ষপাতিত্ব করবে না। ইতিবাচক শব্দমালায় তা এভাবেই বিবৃত: সত্য কথা বল ও সৎ কর্ম কর; সত্যবাদিতা ও সহনশীলতার কৃষ্টিতে নিষ্ঠ থাক।

তৃতীয়ত: তুমি চুরি, শোষণ, ঘুষ-উৎকোচ ও দুর্নীতি করবে না। ইতিবাচক শব্দমালায় তা এভাবেই বিবৃত: সদাচরণ ও নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার কর। সত্যবাদিতা ও সহনশীলতার কৃষ্টিতে নিষ্ঠ থাকে।

চতুর্থত: তুমি যৌন নির্যাতন, জুয়াচুরি, অপমান বা অসম্মান করবে না। ইতিবাচক

শব্দমালায় তা এভাবেই বিবৃত: পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান কর; সবার জন্য অংশীদারী ও সম মর্যাদার কৃষ্টিতে নিষ্ঠ থাক।

হানস্ কূঙ চারটি নির্দেশ বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে সংলাপের জন্য চরম ও পরম প্রয়োজন হিসেবে মিলিয়ে দেখিয়েছেন:

১। ধর্মগুলোর মাঝে শান্তি ব্যতীত জাতিগণের মাঝে কোন শান্তি থাকবে না।

২। ধর্মগুলোর মাঝে সংলাপ ব্যতীত ধর্মগুলোর মাঝে কোন শান্তি বিরাজ করবে না।

৩। বৈশ্বিক নৈতিক মানদণ্ড ব্যতীত ধর্মগুলোর মাঝে কোন সংলাপ হবে না।

৪। অতএব, একটি বৈশ্বিক নীতি নৈতিকতা ব্যতীত এই বিশ্ব মানচিত্রের অস্তিত্বও টিকে থাকবে না।

পোপ ফ্রান্সিস: বিশ্ব শান্তি দিবস ১ জানুয়ারি ২০২২

স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণের জন্য পোপ ফ্রান্সিস তিনটি পথের প্রস্তাব করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রথমত: প্রজন্ম মাঝে সংলাপকে সহভাগিতা প্রকল্পের বাস্তব বা কর্মে রূপান্তরের জন্য ভিত্তি হিসেবে নেয়া। দ্বিতীয়ত: স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও উন্নয়নের অন্যতম উপাদান বা গুণনীয়ক হিসেবে শিক্ষাকে হাতিয়ার করা। তৃতীয়ত: মানব মর্যাদার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য শ্রমসাধ্য কাজকে উপায় হিসেবে নেয়া। এই তিনটি হলো "একটি সামাজিক সন্ধি রচনা সম্ভব" করে তোলার জন্য অপরিহার্য উপাদান। এগুলো ছাড়া প্রতিটি শান্তি প্রকল্পই অবাস্তবতায় বা কল্পনায় পর্যবসিত হবে বলে মনে করেন।

স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা

শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা যা শান্তির সংস্কৃতিকে সংগঠিত করে এবং এর অগ্রগতি সাধনে কাজ করে। এ অগ্রগতির প্রত্যাশিত অবস্থা বা ফল হলো স্থায়ী শান্তি। শান্তি শিক্ষা জ্ঞানের ভিত্তি, দক্ষতা, মনোভাব ও মূল্যবোধকে পরিচর্যা করে। যার ফলে মানুষের মনে বা আচরণের মধ্যে যদি সহিংসতার কোন বীজ থেকে থাকে তার পরিবর্তে শান্তি সংস্কৃতির বীজ স্থলাভিষিক্ত হয় এবং এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে শান্তি শিক্ষা। তাহলে দেখা যায় যে, শান্তি শিক্ষা সংঘাত বা দ্বন্দ্বের ধারণা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে। মানুষকে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দেয় এবং মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে আর তখন শান্তির মূল্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়। শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষার নবতর ধারনাটি নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দিয়ে পুরোপুরি অনুধাবন করা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ নিয়ে মনীষীদের বিস্তর আলোচনা চলছে।

শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যেটা জ্ঞানার্জনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবেও বিবেচিত হয়। একজন শিক্ষার্থীর জন্য ধাপে ধাপে এই জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়। এখানে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সঠিক কর্মপরিকল্পনা এবং কর্মোদ্যোগ নিতে হয় পূর্বসংস্কার বা যুদ্ধ প্রণালীর বিরুদ্ধে অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের পক্ষে। এজন্য শান্তিবাদীদের গভীর মনোযোগী হতে হবে জ্ঞানার্জনের প্রতিটি স্তরে। শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষার উৎস ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। এই পুরো বিষয়টিই সামগ্রিকভাবে একটি প্রক্রিয়া এবং পর্যায়গুলো একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত *(রফিকুল, শাহীনূর ও অনুরাগ: শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন, ২০১৩, ৯৮-১০৫)*

১ম পর্যায়: বোধোদয় পর্যায় (কগ্নিটিভ ফেইজ) অর্থাৎ সচেতন হওয়া, উপলব্ধি করা।

২য় পর্যায়: প্রভাবিত পর্যায় (এফেকটিভ ফেইজ) অর্থাৎ গুরুত্ব অনুধাবন করা, মূল্যায়িত করা, প্রতিক্রিয়া দেখানো।

৩য় পর্যায়: ক্রিয়াশীল পর্যায় (এ্যাকটিভ ফেইজ) অর্থাৎ বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ করা।

শান্তি বিনির্মাণের জন্য শিক্ষা দরকার কেন

শান্তি শিক্ষায় মূল্যবান সামাজিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান। এটা মানুষের বর্তমানকে পরিবর্তনে সহায়তা করে এবং তার জন্য দরকার সামাজিক কাঠামো এবং চিন্তায় পরিবর্তন।

শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ হলো সামাজিক অবিশ্বাস দূর করা, সহিংসতাকে ধ্বংস করা এবং যুদ্ধকে লোপ করা। সামাজিক অবিচার, যুদ্ধ অথবা সহিংসতার বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে মানুষের অবস্থা নাজুক হয়ে যায়, যার কারণে মৃত্যুও হতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বজনীন শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষার মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব (Betty Reardor, *Learning to abolish War: Teaching toward a Culture of Peace, 1988)*।

শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা ধারণার দু'টি ভাগ

১। স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা একটি প্রায়োগিক বিকল্প: শান্তি শিক্ষা পরিণামে প্রায়োগিক সুবিধা দেয় যা যে কোন ধরণের শিক্ষা থেকে আশা করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ ও কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া কোন সমস্যাকে সত্যিকার অর্থে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হয় না। সকলেই যুদ্ধের ভয়াবহতার ধারণা করতে পারি। এ ক্ষেত্রে শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা যুদ্ধের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় এবং বৃহৎ পরিসরে দ্বন্দ্ব নিরসনের পদ্ধতিগুলো, যেমন- সমঝোতা, মধ্যস্থতা, আলোচনা ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরো মজবুত করে। তাই স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষাকে প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহার করলে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা যেমন স্পষ্ট হয় তেমনি প্রায়োগিক শান্তি লাভের পথও সুগম হয়।

২। স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা একটি নৈতিক অপরিহার্যতা: নৈতিকভাবে স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। নৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একতা ও জীবনের মূল্য, মানব মর্যাদা, অহিংসা, ন্যায়বিচার ও ভালবাসা। এই নীতিগুলো স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক বলে দাবী করে এবং নীতির মাধ্যমে পরিচালিত কোন কাজকে শান্তি শিক্ষার প্রায়োগিক প্রভাব বলতে পারি।

১৯৬০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বিশ্ব শান্তি দিবসে পুণ্যপিতা ১৩শ যোহন, ৬ষ্ঠ পল, ২য় জন পল ও বেনেডিক্ট উদাত্ত আহ্বানে যে পবিত্র শান্তি, ইতিবাচক শান্তি, ন্যায়সঙ্গত শান্তি, টেকসই শান্তির কথা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন তারই ধারাবাহিকতায় পোপ ফ্রান্সিস স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণের আহ্বান ও উপায় বাৎলে দিয়েছেন বিশ্ব শান্তি দিবস ২০২২ উপলক্ষে উচ্চারিত বাণীতে। পরস্পর মুখোমুখি হবার কৃষ্টি বিনির্মাণ করতে পারে ধর্মীয় সংলাপ। অর্জন বা পূরণ করতে পারে ন্যায্য, দায়িত্বশীল ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ লক্ষ্যমাত্রা। "শান্তি হলো ঈশ্বরের স্বপ্ন, তাঁর পরিকল্পনা মানবজাতির জন্য, মানবিকতার ইতিহাসের জন্য, সকল সৃষ্টিরও জন্য (পোপ ফ্রান্সিস)।

উপসংহার

সংলাপ একটি কর্ম। সম্প্রীতি ও শান্তি সেই কর্মের ফল। সত্যিকার শান্তি ঈশ্বর থেকে আগত। শান্তি একটি ঐশ দান। স্থায়ী শান্তি এ বিশ্বের ন্যায্যতাকামী সকল মানুষকে, সকল ধর্মবিশ্বাসীকে অঙ্গীভূত করে নেয়। খ্রিস্টানুসারীদের একটি বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে, তা হলো- সংলাপ সম্ভব, শান্তি সম্ভব। স্থায়ী শান্তি বিনির্মাণ শিক্ষা এবং শিখন ফলও সম্ভব॥

সংলাপ: সম্প্রীতি ও শান্তি

ফাদার প্রলয় আগাষ্টিন ডি'ক্রুশ

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান!
নাই দেশ, কাল-পাত্রের-ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশ, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষ জাতি-
... খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয়
সেখানে তালা? ...

মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভিন্ন ভাষাভাষির মধ্যকার সকল ভেদাভেদ নিরশনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল সংলাপ। সংলাপে শান্তিতে সহাবস্থান বাস্তবায়িত করা সম্ভব, যা অন্য কোন উপায়ে তত সহজ নয়। সকল ধর্মের একই, অভিন্ন উদ্দেশ্য, লক্ষ্য হল পরমাত্মার সঙ্গে মিলন। ঐশরত্বের সঙ্গ লাভ, পরজনমে সুখে বাস। সেই অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা ভিন্ন পথ বেছে নেই। যদিও লক্ষ্য স্থির, কিন্তু তবুও লক্ষ্য পূরণে অনেকবারই সংঘর্ষে অবতীর্ণ হই। এই সংঘর্ষ এড়ানোর অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল সংলাপ।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত বহু পুরাতন, আবার ধর্ম ভীরুতার পাশাপাশি ধর্ম নিয়ে সংঘর্ষের নজিরেরও কমতি নেই এখানে। তাই সকল বাঁধা দূর করে শান্তি, সম্প্রীতিতে সহাবস্থান করতে চাই। এই জন্য সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। সংলাপ খুবই সাধারণ একটা শব্দ, যার বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। সংলাপ সাধারণভাবে যার অর্থ দাঁড়ায় কথাবার্তা, কথোপকথন, ভাব বিনিময়, মতবিনিময় ইত্যাদি। সম্প্রীতি শব্দের অর্থ ঐক্যমত, সন্ধি, সমঝোতা, মিলে মিশে থাকা আর শান্তি মানে স্বস্তি, বিরোধহীন নিশ্চিন্ত জীবন, যা আমাদের সকলেরই চাওয়া।

বিভিন্ন ধর্ম তাদের ধর্ম চর্চার বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষার নানাবিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকগণ তাদের প্রচার কার্যের শুরুই করেছেন সংলাপে ও সম্প্রীতিতে। যা খ্রিস্টান মিশনারীদের মধ্যে দেখা যায়, আবার প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মপ্রচারক সুফীদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। সুফীরা তাদের সাধারণ সহজ সরল জীবন যাপন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ভক্তিমূলক গান, প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস ও শান্তিপ্রিয়তার জন্য সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি শান্তিতে বসবাসের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই আজও সম্ভব আমাদের এই দেশমাতৃকায় যেখানে নানা ধর্ম-মতের মানুষের সংমিশ্রিত বসবাস সেখানে সংলাপচর্চার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান করা।

বর্তমান সময়ে সংলাপ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আমরা একা নই, আমরা অন্যদের সঙ্গে বসবাস করি; যারা ভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ, যারা ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করে। আমাদের জীবনে প্রতিটি পদে আমরা অন্যদের সঙ্গে জড়িত, আমাদের নানা প্রয়োজন মেটাতে অন্যদের উপর নির্ভর করতে হয়, যারা একই ধর্মের বা জাতি গোষ্ঠির মানুষ নন। তাই শুধুমাত্র ধর্ম আলাদা হওয়ার কারণে আমরা আমাদের পাশের মানুষদের এড়িয়ে চলতে পারি না। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারি না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় এবং বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হয়, এটা আমাদের সকলের পক্ষেই ভালো। আমাদের মনে রাখতে হয় যে, যদিও তারা অন্য ধর্মের কিন্তু তবুও তারা আমাদেরই ভাইবোন। আমাদের কাথলিক মণ্ডলী গোড়া থেকেই তার জনগণকে উৎসাহিত করে, যেন সংলাপের মধ্যদিয়ে অন্য ধর্মের ভাই-বোনদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাথলিক মণ্ডলী সংলাপের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয় এবং সংলাপকে জীবনের অংশ বিবেচনা করে। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মণ্ডলীর প্রেরণ কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের গোটা জীবনটাই নানভাবে সংলাপের সঙ্গে জড়িত। তবুও সম্প্রীত, শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি দিক চিন্তায় রেখে অগ্রসর হতে পারি। এ বিষয় যৎসামান্য আলোকপাত করা হল।

জীবনমুখী সংলাপ: মানব জীবনের কোন কর্মকাণ্ডই সংলাপ বহির্ভূত নয়। আমরা কোন না কোন ভাবে জানা অজানায় সংলাপের সঙ্গে জড়িয়ে আছি। খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের রীতি নীতিই হল জীবন ধর্মী সংলাপ। সংলাপ শুধু মাত্র অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সাধারণ কুশল বিনিময়, আলাপ আলোচনা নয়, এই সংলাপের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য আছে। সংলাপ হল আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশিকে জানা, তার ধর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং পাশাপাশি কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে পরস্পরকে আরো বেশী বুঝতে পারা যায় এবং নিজেদের মধ্যকার সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। জীবনমুখী সংলাপ হল আমাদের এমন খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের চর্চা করা যাতে করে আমরা আমাদের প্রতিবেশিদের (অন্য ধর্মাবলম্বীদের) সঙ্গে একসাথে পরিবারের মত বসবাস করতে পারি। আমাদের জীবন যাপন দ্বারা তাদের আকৃষ্ট করতে পারি; যে যাপিত জীবন এমন সাক্ষ্য দেয় যে তারা আমাদেরই একজন। আমাদের উপস্থিতি যেন খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ প্রকাশ করে। আমরা প্রতিনিয়ত যেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি, দুঃখ-কষ্ট আনন্দের সহভাগিতা করে তার অংশীদার হতে পারি। পরস্পরের প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি, তা হতে পারে আমাদের কর্মক্ষেত্রে কিংবা সমাজের সামাজিক জীবনে। এইভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে এসে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যেকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান করি। মূলত: আমাদের

জীবন সাক্ষ্য দ্বারাই আমরা জীবন সংলাপ করি।

উৎসব আয়োজন অনুষ্ঠানধর্মী সংলাপঃ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব হতে পারে সম্প্রীতি শান্তিময় দিক প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সম্প্রীতির দেশ হিসাবে আমাদের দেশে এই রকমটা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা যায় যে- হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এক সঙ্গে নানা সামাজিক উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। শুধু তাই নয়, যেহেতু তারা একসঙ্গে বসবাস করে, তাই পরস্পরকে তারা নিজেদের ধর্মীয় উৎসবে নিমন্ত্রণও জানায়। বড়দিন, ইস্টার, ঈদ, দূর্গাপূজা প্রভৃতিতে পরস্পর পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানায়, সাক্ষাৎ করে, মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তায় শুভেচ্ছাসহ যোগাযোগ করে এবং একে অন্যের বাড়ীতে বেড়াতে যায়, এমন কি খাওয়া দাওয়াও করে। পরস্পরের খাবার পরিবেশনে তারা সচেতন, সর্তক থাকে এবং সম্মান প্রদর্শন করে। ধর্মীয় এই বিশিষ্ট দিনগুলির প্রতি সম্মান দেখিয়ে রাষ্ট্র সাধারণ ছুটি দিয়ে থাকে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও শুভেচ্ছা জানানো হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এবং অনান্য মিডিয়া গুরুত্বের সঙ্গে নেয় এবং সংবাদ প্রচারে সরব থাকে।

শুধুমাত্র ধর্মীয় কেন! জাতীয় বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনেও সম্প্রীতি সমানভাবে লক্ষ্যণীয়। আমাদের প্রাণের জাতীয় দিবসসমূহ- ভাষা শহীদ দিবস বা বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস; ২১ ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ) ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে বাঙালি জাতি হিসাবে আনন্দে উৎসবে পরস্পরের হাতে হাত ধরে পালন করা হয়। সেখানে ধর্মীয় পরিচয় কেউ দেখে না, কেউ কারও বিষয় দ্বিতীয় মনোভাব পোষণ করে না। এছাড়াও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী একইভাবে পালন করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে উক্ত দুই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন কিন্তু তাদের ধর্মীয় পরিচয় কখনোই প্রাধান্য পায় না। বরং এর মধ্যদিয়ে সম্প্রীতির এক অমেয় ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মমুখী সংলাপঃ কর্মমুখী সংলাপ হল সবচেয়ে গভীর, সুস্পষ্ট ও দৃশ্যমান সংলাপ যা সংলাপের ভাষাকে বাস্তব রূপ দেয়। বাস্তবিকই কর্মমুখী সংলাপ একটি কার্যকর পদক্ষেপ যা কিনা শান্তি সম্প্রীতি গড়ার ক্ষেত্রে নানামুখী রূপরেখা তৈরী করতে সহায়তা করে। বাস্তবমুখী এই সংলাপ সাধারণত বিভিন্ন সময় ধর্মীয় ও অন্যান্য নেতা-নেতৃগণ উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ করেন। এর লক্ষ্যে তারা নানা আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, মিটিং, র‍্যালী প্রভৃতির মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় বা আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপকে উজ্জীবীত রাখে। গ্রামে, শহরে কোনরূপ ধর্মীয় বিরোধ বা সমস্যার সৃষ্টি হলে সংলাপের মাধ্যমে তার কার্যকরী সমাধা খুঁজে বের করে শান্তি বজায় রাখে। কর্মমুখী সংলাপ, সংলাপের অবিচ্ছেধ্য অংশ বলা যায়। স্থানীয় ও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এই ধরনের সংলাপ ন্যায্যতা, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নানারূপ সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করা কর্মমুখী সংলাপের একটি বিশেষ দিক।

অনুচিন্তন ও আলোচনাধর্মী সংলাপঃ সংলাপ বলতে তো মোটামোটি আলোচনা, সহভাগিতাকেই বুঝি, তবে হ্যাঁ, পার্থক্য বলতে এ আলোচনা একটু ভিন্নধর্মী আলোচনা। পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চিন্তা-ভাবনা, অভিমত সহভাগিতা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; আর সেই জন্য একটা ভিন্ন প্লাটফর্ম দরকার। সেই প্লাটফর্মই আমাদের সংলাপের সুযোগ সৃষ্টি করবে যেখানে আমরা শান্তি স্থাপনের জন্য আমাদের বক্তব্য ও অনুচিন্তন সহভাগিতায় করতে পারব। খ্রিস্টমণ্ডলীর একটি অন্যতম লক্ষ্য হল অন্যদের সঙ্গে সংলাপের মধ্যদিয়ে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে আমরা পরস্পরের ভাই-বোন হতে পারি। সংলাপের মধ্যদিয়ে আমরা যা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সেই সকল বিষয়বস্তু প্রভৃতি মিটিং ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে মতবিনিময় করতে পারি। এছাড়া সংলাপের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছেও পৌঁছে দিতে পারি, তৎসঙ্গে বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে সংলাপের অনুচিন্তাগুলি প্রচারের প্রয়াস পেতে পারি; যা আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংলাপে প্রত্যাশিত গতি আনবে।

আধ্যাত্মিক সংলাপঃ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আমরা যে সংলাপ করে আসছি, তার নিগূঢ় রহস্য পবিত্র ত্রিত্বের নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে বিদ্যমান। এই ঐশ সম্পর্ক আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়, যেন আমরাও আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের মিলন বন্ধন সুদৃঢ় রাখি। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাঝে আধ্যাত্মিক চেতনা অনেক বেশী গুরুত্ব বহন করে। মূলত: আধ্যাত্মিক সংলাপ আমাদের শক্তি দেয় অন্য ধর্মের বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা করে। অন্য ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্য, সুন্দর, পবিত্র বিষয়গুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সহনশীল হতে মনকে প্রস্তুত করে। কাথলিক মণ্ডলী উদ্যোগ গ্রহণ করে যেন আমরা সম্প্রীতি, সংহতির মধ্যে জীবন যাপন করতে পারি এবং একত্রে বসে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করতে পারি, আনন্দ ও মিলনের এবং শান্তির চিহ্ন হিসাবে এক সঙ্গে বসে খাবার গ্রহণ করতে পারি।

এটা খুবই আনন্দের যে আমাদের দেশে প্রায়শ: লক্ষ্য করা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের পূর্বে ধর্মগ্রন্থ হতে পাঠ করা হয় এবং সেখানে সকল ধর্মের গ্রন্থ হতে পাঠ করার সমান সুযোগ দেওয়া হয়, যা কিনা একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত। আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এ থেকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্য ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি সহনশীল হতে এবং সম্মান জানাতে অভ্যস্থ হয়। এছাড়ও অনেক সেবা প্রতিষ্ঠানে, কর্ম প্রতিষ্ঠানে দিনের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে আন্তঃধর্মীয় প্রার্থনা করা হয়। কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দরিদ্রদের সঙ্গে সংলাপ : আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত হয়ে সমাজের অনেক প্রকার সুবিধার বাইরে অবস্থান করে। তারা সুবিধা বঞ্চিত বলে নিজেরাও নিজেদের গুটিয়ে রাখে। এই সকল দরিদ্র মানুষদের সংলাপের মাধ্যমে উজ্জীবিত করতে হবে। তাদের সঙ্গে সংলাপের ক্ষেত্রে শুধু আধ্যাত্মিক কিংবা বক্তব্য বা আলোচনা সভা যথেষ্ট নয় বরং বৈষয়িক সহযোগিতার মাধ্যমে সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে। সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয়, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে নানাবিধ সেবার দ্বার উন্মুক্ত করে সংলাপে অংশ নিতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্টির প্রতি মণ্ডলী সর্বদাই সচেতন ও সহনশীল। দরিদ্রদের প্রতি সেবা ও সংলাপে আহ্বান করে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, 'দারিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক শান্তি সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রীজ তৈরী করতে হবে।' আর সংলাপই এর মধ্যকার সেতু-বন্ধন হয়ে কাজ করবে।

আমরা বিশ্বের যেখানেই, যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আমার সকলেরই আকাঙ্ক্ষা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বসবাস করা। কিন্তু আমাদের সেই প্রত্যাশিত শান্তি নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। শান্তি নষ্টের কারণ অন্য কিছু বা অন্য কেউ নয়, আমরা নিজেরাই। আমরাই পরস্পরের বিরুদ্ধে যাই, অন্য জাতি, অন্য গোষ্ঠী, অন্য ধর্ম বলে একে অন্যকে আখ্যায়িত করি, শত্রুতা সৃষ্টি করি আর এইভাবে অশান্তি ডেকে আনি। আমাদের মধ্যে ভিন্নতা আছে বলেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টি আসে। তাই যেহেতু আমাদের সকলেরই কাম্য শান্তি, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সংলাপের বিকল্প আর নাই। পরিবারে শান্তি রক্ষায় পারিবারিক সংলাপ প্রয়োজন একইভাবে ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ খুবই জরুরী। বিশ্বময় ধর্মীয় শান্তি রক্ষায় সকলকেই সামিল হতে হবে। দূর হোক শত্রুতা, অশান্তি, বিরোধিতা, সংলাপে, শান্তিতে, সম্প্রীতিতে, বলীয়ান হোক সহাবস্থান॥

জীবন বাস্তবতাই হোক সম্প্রীতি সিনোডালিটি - ফ্রাতেল্লী তুত্তি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

শিরোনামটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধ্যান-অনুধ্যানের ফল। শিরোনামটি বুঝে নিই। এই বুঝে নেওয়াতেই বিশ্লেষণ; অনুধাবন ও জীবনে বাস্তবায়ন।

১। সম্প্রীতি, সম+প্রীতি। সবাইকে সমানভাবে গ্রহণ করা, স্বীকৃতি দেওয়া, প্রীতি করা, ভালবাসা। যিশুর আদর্শে সর্বজনীন ভালবাসায় সবাইকে আবদ্ধ করা কথায়, কাজে ও আচরণে। লুক দেখিয়েছেন যে, যিশু দ্বারা আনিত পরিত্রাণ সর্বজনীন পরিত্রাণ; গোটা মানবজাতির পরিত্রাণ।

(ক) ত্রিত্বের সম্প্রীতি : পবিত্র ত্রিত্ব, তিন ব্যক্তি; একক হিসেবে ঈশ্বর। ১০০% ঈশ্বর। তাঁদের ভূমিকা একক। পিতা ঈশ্বর: ভূমিকা: সৃষ্টিকর্তা; পুত্র ঈশ্বর ত্রাণকর্তা, পিতার পূর্ণ প্রকাশ; সবকিছুই পিতার ইচ্ছা অনুসারে। যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকে দেখেছে। এমন গভীর মিলন, একাত্মতা, বন্ধন। একক, কিন্তু পিতা ও পুত্র মিলে এক। পবিত্র আত্মা: নিত্য সহায়ক, ঐশশক্তি; মিলন বিধায়ক; পরিত্রাণকর্মে ঐশশক্তি; যিশু এই পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত; আত্মার শক্তিতে ও পরিচালনাতেই যিশুর জীবন পরিচালিত। আত্মারূপে তিনি একক, ভূমিকা একক। এই তিন একক মিলে এক ঈশ্বর, ত্রিত্ব ঈশ্বর। 'ত্রিব্যক্তিতে এক ভগবান'। এই সত্যটিকে ঘিরে সুন্দর একটি ভজন-গান রয়েছে গীতাবলীতে। ভীষণ সমাদৃত বিশ্বাসীদের মাঝে। এই তো সেদিন সিবিসিবি সেন্টারের সভাকক্ষের মঞ্চে তিনজন মেয়ে ভক্তি-নৃত্যের মধ্যদিয়ে ত্রিব্যক্তির নিজ নিজ ভূমিকা প্রকাশ করেছিল। নৃত্যের মুদ্রাগুলো একদম প্রকাশ করেছিল ত্রিত্বের নিজ নিজ কর্ম। "স্বর্গ বাহিনী করিছে অর্চনা": এই ত্রিত্ব ঈশ্বর, তিনে মিলে এক ভগবান। এই ভগবানের জয়গানে উল্লসিত স্বর্গবাহিনী। পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বের পরের পবিবার পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব।

(খ) আমাদের জন্য শিক্ষা: আমাদের প্রত্যেকেরই সেবা দায়িত্ব রয়েছে। একক সেবা দায়িত্ব। পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে আমাদের ভূমিকা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরই সমান মূল্য, ভূমিকার সমান মূল্য। আমরা কি সেই সমান মূল্য দেই? সমান স্বীকৃতি দেই? হতেও তো পারে, পবিত্র ত্রিত্বের মিলন-সমাজ ভিত্তিক কথাগুলো শুধু অনুভূতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে: মঞ্চে, বাণীমঞ্চে, ছোট-বড় পরিসরে। সম্প্রীতি দিবসে আসুন, পবিত্র ত্রিত্বের এককত্ব ও ত্রিত্বিক মিলন (Trinitarian Communion) রহস্য ধ্যান করে, অনুভূতি থেকে বেরিয়ে এসে জীবন বাস্তবতায় কার্যকর করি।

২। সিনডালিটি: শব্দটি গ্রীক ভাষাভিত্তিক। গ্রীক ভাষায় "ছুন" (soon) অর্থ সাথে, সহ; আর 'হদস' (hodos) অর্থ পথ, পথ চলা, পথযাত্রা। সিনড অর্থ : সহযাত্রীক হয়ে হাঁটা, পথচলা। কারা সহযাত্রীক হয়ে পথ চলে? পরিবারে: স্বামী, স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ছেলে মেয়ে সবাই। সবাই এই পথ চলায় অন্তর্ভূক্ত। তবে সবারই একক স্থান রয়েছে, একক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। মণ্ডলীতে ঐশজনগণ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর, প্রতিবন্ধী, পোপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার সবাই একসাথে সমপথযাত্রী। এখানে প্রধান চিন্তা হল: (১) সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করা। পরিবারে, সমাজে, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে, মণ্ডলীতে, ধর্মপল্লীতে, প্রতিষ্ঠানে এবং আরো। কেউই যেন মনে না করে যে সে/তিনি/তারা বাইরের অথবা excluded; তাদের বেশী 'কদর' নাই; তাদের উপস্থিতিরও তো মূল্য আছে; হতেও তো পারে বহু দিন ধরে বহির্ভূতরা ধারণা করতে বাধ্য হয়েছে: "আমি/আমরা তো বহির্ভূত ---।" পোপ মহোদয় বলছেন: কাউকেই "বাইরে" রাখা যাবে না।

(২) সবাইকে ন্যায্য মূল্য, মর্যাদা দিতে হয়। সবাই এক সাথে হাঁটবে। আর একেই বলে সিনডালিটি! এখানে আছে সবার সাথে সবার মিলন; পরিকল্পনা হোক, প্রকল্প হোক; মিটিং হোক ---- সবারই অংশগ্রহণ। সবাইকে শ্রবণ; সবাইকে সুযোগ-দান এবং আরো। শেষে কার্যক্রমেও সবার অংশগ্রহণ; এবং প্রেরণ-দায়িত্ব পালন। এইখানেই সিনডালিটি।

উপরোক্ত কথাগুলো আমরা বলতেই আছি; অনুভূতি নিয়ে উপস্থাপন করেই যাচ্ছি। এই সম্প্রীতি দিবসে একসাথে সমযাত্রিক হয়ে পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে, প্রতিষ্ঠানে, সমাজ কল্যাণ সংস্থায় সিনডালিটি তথা একসাথে সহ ও সমযাত্রিক হওয়ার বিষয়টিকে অনুভূতি থেকে বেরিয়ে এনে বাস্তবে প্রকাশ করি।

(গ) এই 'এক সাথে পথ চলার' ব্যক্তিগুলোর বিশেষ বিশেষ সেবা দায়িত্ব রয়েছে; খুবই একক; যার যার দায়িত্ব। সিনোডালিটি যেখানে, সেখানে প্রত্যেক দায়িত্ব, সেবা-দায়িত্যেও মূল্য আছে। "উচ্চ" দায়িত্ব; "নিচু" দায়িত্ব যখন বলি, তখনই আমরা বৈষম্য সৃষ্টি করি। প্রেরিত শিষ্যরাও এমন ভেদাভেদ ও বড়-ছোট নিয়ে তর্কাতর্কী করেছিল (মার্ক ১০:৩৭; ৪১)। যিশুর পরামর্শ ওদের কাছে: "তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।" তোমরা কেউই আচার্য নও; প্রভুও নও, গুরুও নও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই (ফ্রাতেল্লী তুত্তি)।

(ঘ) আমাদের প্রতি আহ্বান: আসুন, অনুভূতি থেকে, মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে জীবন বাস্তবতায় বা এক সাথে পথযাত্রিক হয়ে, মিলনের মনোভাবে আমরা যে প্রকৃতই সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের আমেজে সিনডাল, তা প্রকাশ করি; যেন সবাই দেখতে পায়, লোকটির/লোকগুলোর মনোভাবই শুধু সিনডাল নয়, সিনডালিটি প্রকাশ পায় তার/তাদের কথা-কাজ ও আচরণে; সম্পর্কে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে। এর/এদের কাছে সবাই "ভিতরের" মানুষ; কৌশলে কাউকেই বাইরে রেখে দেয় না। তাই সম্প্রীতি ত্রিত্বিক মিলন এই সিনডালিটির মধ্যেও। সম্প্রীতি, সিনডালিটি'র মূল শিক্ষাবাণী তো একই, একদম সমান্তরাল। দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন; সম্পর্ক, মিলন, ভ্রাতৃত্ব অভিন্ন।

৩। "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" (Fratelli Tutti) শব্দটি ইটালিয়ান ভাষায়। শব্দটি একটি বিশেষ্য বা noun (plural); ফ্রাতেল্ল (Fratello) হল এক বচন; অর্থ ভাই। যাজক যখন বলেন: "ভ্রাতৃগণ প্রার্থনা কর ------- গ্রহণযোগ্য হয়"; তখন এই 'ভ্রাতৃগণ' বলতে তো ভাই-বোনগণ বুঝায়; উত্তর দেয় নারী-পুরুষ যুবক-যুবতী সবাই একসাথে। তাই ফ্রাতেল্লী অর্থ ভাইবোনেরা; 'তুত্তি' অর্থ "সবাই"। 'ফ্রাতেল্লী তুত্তি'র একদম আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়: ভ্রাতৃ সবাই; ভ্রাতৃ-সকল। ব্যাখ্যা করলে, ভ্রাতৃত্বে আমরা সবাই; আমরা সবাই ভাই-বোন।

(ক) সম্প্রীতি দিবসে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" (ভ্রাতৃ-সকল) শিরোনামে এই সর্বজনীন পত্রটির দ্বিতীয় অধ্যায়টি (অনুচ্ছেদ ৬৩-৮৩) খুবই প্রাসঙ্গিক। পোপ মহোদয় বলছেন, সবাই আমার ভাইবোন। যিশুর দেওয়া "দয়ালু সামারীয়" উপমা প্রসঙ্গ টেনে পোপ মহোদয় অনুধ্যানে প্রকাশ করেন যে, ইহুদী আহত, সেই আহতজনকে কথায় নয়, অনুভূতি দিয়ে নয়, একেবারে বাস্তবে প্রেমপূর্ণ সেবা দিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ এগুলোর উর্ধ্বে গিয়ে এক সামারীয় *(লুক ১০:২৫-*

৩৭)। বাইবেলীয় ধারণায় সামারীয় লোকটি সর্বজনীনতার (universality) প্রতীক। তার কাছে ইহুদী-অইহুদী কোন ব্যাপারই না; তার মনোভাব, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা সর্বজনীন। সবাই তার ভাই, সবাই তার বোন। আর আহত ব্যক্তিটি? আমরা সবাই এমন অবস্থায় পড়তে পারি। যে-সব যাজক ও লেবীয় পাশ কাটিয়ে গেল তারা দূরত্ব সৃষ্টি করল; বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করল। 'আমরা স্পর্শ করলে অশুচি হয়ে উঠব।' "আমরা উপরের"; ওই লোকটি "ছোট" "আমাদের দলেরর নয়"। পাশ কাটিয়ে যায়। গল্পে যিশু অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, আমরা যেন সর্বজনীন ভালবাসা ও সম্প্রীতির মানুষ হয়ে উঠি এই প্রত্যয়ে যে, আমরা সবাই ভাই-বোন। কেউই 'বাইরে ফেলে দেওয়া'র নয়। সেবা, স্বীকৃতি, বেদনা-সমবেদনা, প্রশংসা, অনুপ্রেরণা, সেবা-সুশ্রুষা সবার জন্য *(গালাতীয় ৫:৬; ১ম যোহন ৩:১৪)*। সাধ্বী মাদার তেরেজার জীবন-আদর্শ সামনে নিয়ে আসি। এই মহান সাধ্বীর কাছে সবাই তাঁর ভালবাসা ও সেবার পাত্র।

(খ) পুণ্য পিতার পত্রটিতে সংলাপ (Dialogue) একটি বড় বিষয় (ষষ্ঠ অধ্যায়)। সংলাপ-সম্প্রীতির কথা বলি, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয় কথা বলি মঞ্চে, বেদীমঞ্চে, গ্রামে-গঞ্জে, মণ্ডলীতে, প্রতিষ্ঠানে, সভা-সেমিনারে। কিন্তু নিজেদের ভিতরে? নিজেদের মাঝে? পোপ মহোদয় জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবাইকে নিয়ে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে বলেছেন সংলাপের মধ্যদিয়ে।

(গ) শ্রবণ: 'সিনডালিটি' ও 'ফ্রাতেল্লী তুত্তি' বলছে, সংলাপের জন্য এবং মিলনধর্মী বা সমযাত্রিক মণ্ডলীর জন্য প্রয়োজন "শ্রবণ" (Listening); শ্রবণের ধারণা ও ধরণই বলে দেয় এই শ্রবণে মিলনাত্মক মনোভাব বা ভ্রাতৃ মনোভাব আছে কিনা। বাস্তবে, কয়েকজনের কথা খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়; আবার অনেক জনের কথা একটু শোনার পর 'ঘড়ি দেখা'; "আমার সময় নেই" 'মুখাবয়বের মধ্যে বিরক্তি-ভাব' ইত্যাদি।

(ঘ) শ্রবণ, যিশুর উদাহারণ: যিশু অন্ধ বার্তিমেয়'র কথা, তার কান্না অন্তর দিয়ে শ্রবণ করেছিলেন *(মার্ক ১০:৪৭, ৫১)*; আবার 'পদের' জন্য, 'বিশেষ সম্মানের আসন'-এর অনুরোধ নিয়ে আসা সেই শিষ্য দু'জনের আবদারও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছিলেন *(মার্ক ১০:৩৫-৪০)*। এক জনের অনুরোধ গ্রহণ করেন *(মার্ক ১০:৫২)*; ওই দু'জনের নয় *(মার্ক ১০:৪০)*; যিশু তাদের ধিক্কার-বাণী না শুনিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা-বাণী শোনান *(মার্ক ১০:৪১-৪৫)*। যিশুর কাছে সবাই মূল্যবান। সবার কথাই গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণে নিয়ে আসেন। আর এইখানেই সম্প্রীতি, সিনডালিটি ও ফ্রাতেল্লী তুত্তি বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সবার প্রতি আহ্বান: এই সম্প্রীতি দিবসে আসুন অনুভূতি থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে মূল্য দিয়ে, সবাইকে সমানভাবে ভালবেসে, কোন বৈষম্য সৃষ্টি না করে হয়ে উঠি আমরা সবাই সবার ভাইবোন, সবার প্রতিবেশি। সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করি সবাইকে জীবন-দৃষ্টান্তে, জীবন বাস্তবতায়।

৪। বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো নির্ণয় করি

- সবাইকে সমভাবে প্রীতি করা; ভালবাসা; গুরুত্ব দেওয়া; মর্যাদা দেওয়া; ভালবাসা।
- সবাইকে নিয়ে পথ চলা; মিলনধর্মী সমাজ, মণ্ডলী গঠন প্রথমে মনোভাবে, পরে জীবন- দৃষ্টান্তে।
- কাউকেই বাইরে বা বহির্ভূত (excluded) করে রাখা নয়। কথা বলার কায়দা-কৌশল না থাকলেও তার উপস্থিতিকে (presence) মূল্য দেওয়া; তার/তাদের নীরব-কথাগুলো শ্রবণ করা।
- অন্তর দিয়ে 'শ্রবণ' বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- তত্ত্বকে (Theory) সত্য ক'রে জীবন দৃষ্টান্তে প্রকাশ করা (life witness)। অনুভূতির পর্যায় (feelings level) থেকে সবাই আমরা ভাই-বোন, ভ্রাতৃ-সকল, শান্তি-সম্প্রীতি, সমসাথী/পথ যাত্রিক/মিলনধর্মী হয়ে পথচলা একই সমান্তরালে রেখে মূল বাণী বা শিক্ষাকে জীবন-বাস্তবতায় (life example/ practical) নিয়ে আসা।
- "দয়ালু সামারীয়র গল্প" *(লুক ১০:২৫-৩৭)* এবং পূণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের সর্বজনীন পত্র "ভ্রাতৃ-সকল" এর আলোকে যিশুর শিক্ষা নিজ নিজ বাস্তবতায় বাস্তবায়ন করা।
- এইভাবেই "সম্প্রীতি", "সিনডালিটি" (সহযাত্রিকতা) ও "ভ্রাতেল্লী তুত্তি" (ভ্রাতৃ-সকল) শুধু ১০ জুন সম্প্রীতি দিবসে নয়, শুধু অনুভূতিতে নয়, মাঠে-মঞ্চে নয়, সভা-সেমিনারে নয় বরং এর শিক্ষাবাণী জীবন-বাস্তবতায় প্রকাশ ক'রে নিত্যদিনের করণীয় অনুশীলন ক'রে তোলা।

এই সপ্ত চ্যালেঞ্জ এক চলমান, প্রবাহমান সাধনা বৈকি! এই সাধন-সাধনায় সার্থক হতে পারি আমরা সবাই ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহে যা অর্জন করা যায় প্রার্থনায়, ধ্যান-সাধনায়॥ ঌ

স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মাধ্যম সংলাপ

(২০ পৃষ্ঠার পর)

লাভের জন্য আসুন আমরা অন্তরে খ্রিস্টের উপস্থিতি উপলব্ধি করি এবং তাঁরই সাথে প্রতিদিন নীরবে একটু সময় নিয়ে সংলাপ করি।

৮। সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন। আমরা হয়তো একেকজন এক এক নামে মাত্র তাঁকে ডাকি। অর্থাৎ আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনাকেও সৃষ্টি করেছেন। সব মানুষই এক ও অভিন্ন বিশ্বপিতার সন্তান। আমরা সবাই একই বিশ্বের বাসিন্দা, একই মানব পরিবারের সদস্য। সুতরাং আমরা সবাই পরস্পর ভাই-বোন। তাই যিশুর আদেশ অনুসারে আসুন আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, পরস্পরের সাথে সংলাপ করি ও শান্তি স্থাপন করি।

৯। সবার মধ্যেই বিবেক নামক একটি কণ্ঠস্বর আছে যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে এবং সেই মত জীবন যাপন করলে আমরা শান্তিতে প্রতিদিনকার জীবন উপভোগ করতে পারবো। কেননা এই বিবেকই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদালত, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের নির্ণায়ক ও মাপকাঠি। তাই আসুন আমরা আমাদের বিবেকের কথা শুনি ও তার সাথে সংলাপ করে সবার সাথে একত্রে পথ চলি ও শান্তি বজায় রাখি।

১০। আমরা যদি নিজের প্রতি, পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি ও প্রতিবেশির প্রতি দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, দানশীলতা, কিছু দাবী না করে আর্ত-পীড়িতের সেবা, করতে পারি তবেই নিজে শান্তি পাব এবং অন্যকেও শান্তি দিতে পারবো।

সবশেষে, সাধু পৌলের সাথে একাত্ম হয়ে বলি, "শোন ভাই, তোমরা আনন্দেই থাক, পূর্ণতা লাভের পথে এগিয়ে চল। একে অন্যের অন্তরে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোল; হয়ে ওঠ একমন ও একপ্রাণ; নিজেদের মধ্যে তোমরা শান্তি বজায় রেখে চল। তাহলে সেই প্রেমবিধাতা, শান্তিবিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সহায় থাকবেন *(২য় করিন্থীয় ১৩:১১)*।" তাই আবারও বলি এসো আমরা প্রাণ খুলে পরস্পর পরস্পরের সাথে সংলাপের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হই, মিলিত হই একই খ্রিস্টের ছত্র-ছায়ায়, অংশগ্রহণ করি মাণ্ডলীক কাজে এবং প্রেরিত হই এক শান্তিপূর্ণ ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে। প্রভু আমাদের সহায় হোন॥ ঌ

বৈচিত্র্যতায়ই পূর্ণতা

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

বৈচিত্র্যতা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্নতাকে বা ভিন্নতাকে। অর্থাৎ যা কিছু সমজাতীয় বা একই ধরণের নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন কিছুর সংমিশ্রণ। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ। মানুষ, গাছ-পালা, পশু-পাখি, মাটি, পানি, বায়ু প্রভৃতির মধ্যে আপন আপন রং, গন্ধ, আকার, সাকার, স্বকীয়তা প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও সবকিছু কী অনুপমভাবে মিলেমিশে একাকার! প্রকৃতপক্ষে, বৈচিত্র্যতা এনেছে আর্ট। একই রকম পোশাকের মধ্যে যখন নানা রঙের বিন্যাস ও নজরকাড়া ডিজাইন করা হয়, তখন তা আরও শৈল্পিক হয়ে ওঠে। পোশাকগুলো ভিন্ন মাত্রা পায়। তেমনিভাবে নানান রঙে ও বর্ণে সাজানো ঘরও নান্দনিক হয়ে ওঠে। ফুলগুলোও নানা প্রজাতি, রং, সুবাস প্রভৃতির ভিন্নতায় এই পৃথিবীকে সাজিয়ে রাখে, করে তোলে সুরভিত।

বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই চলছে আপন গতিতে। গাছপালা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রেখে চলছে, বংশবৃদ্ধি করছে। কিন্তু কেবল মানুষের বেলায় তা বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ধর্ম ও বর্ণকে কেন্দ্র করে কত শত প্রাণ যে হারিয়ে গেছে তা হিসাব নেই। সেই ধারা কি থেমে গেছে? চারিদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মানুষ দিনের পর দিন নিজেদের মধ্যে বিভেদের দেয়াল তুলেই চলেছে। সারা জগতে মানুষ ধর্মে, বর্ণে, জাতিতে, প্রীতিতে, দেশে বিভক্ত হয়েই চলেছে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের প্রতি, এক জাতির মানুষ অন্য জাতির প্রতি, এক দেশের মানুষ অন্য দেশের প্রতি অসহনশীল ও শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করছে। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি এবং গোলাবারুদ তৈরিও থেমে যায়নি। পাশাপাশি, নিত্য নতুন অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের আবিষ্কার গতি পেয়েছে। কেন এই অসহিষ্ণুতা? ঈশ্বরের প্রকৃতি তো আমাদের এই শিক্ষা দেয় না!

আমরা এই পৃথিবীতে উদ্যানই চাই, বাগান চাই না। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক: উদ্যান (Park) বলতে আমরা সাধারণত প্রাকৃতিক বা প্রায় প্রাকৃতিক কোন সংরক্ষিত অঞ্চলকে বুঝি। তবে কৃত্রিম উপায়েও উদ্যান তৈরি করা হয়ে থাকে। মূল কথা হল, যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই বিভিন্ন প্রকার গাছপালা থাকে এবং প্রয়োজনে রোপণ করা হয়। কোনো কোনো উদ্যান বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক আবাস রক্ষা এবং জীবন্ত মাছ ও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ করার জন্য তৈরি করা হয়। যেমন- ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, মধুপুর জাতীয় উদ্যান, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, সিংড়া জাতীয় উদ্যান প্রভৃতি। অন্যদিকে, বাগান (Garden) হল একখণ্ড জমি, যা ফুল, ফল, গাছপালা, লতাপাতা উৎপাদনসহ অন্যান্য উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ফুল, ফল পাওয়ার জন্য এতে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ, নিষ্কাশনসহ আগাছা উৎপাটন করা হয়ে থাকে। বাগান মূলত শখের বশে, বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কিংবা বাণিজ্যিক উদ্দেশে তৈরি করা হয়। যেমন- গোলাপ বাগান, আম বাগান, রাবার বাগান, আনারস বাগান প্রভৃতি। বাগানে একচেটিয়াভাবে সমজাতীয় ফুল বা ফল গাছের প্রাধান্য থাকে। এই ধারণা থেকে চিন্তা করলে বলা যেতে পারে, একটি সমাজে বা দেশে কেবল এক ধর্ম বা গোষ্ঠীর মানুষই বাস করবে, অন্যরা বাস করতে পারবে না, তেমনটা প্রত্যাশা করা অনুচিত। কারণ ঈশ্বর প্রকৃতিতে বাগান সৃষ্টি করেননি, তিনি উদ্যান সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই ইউনিফরমিটি'র ধারণা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করছে। যদিও এ ধারণা বহু পুরনো তথাপি এই আধুনিক যুগেও মানুষের এই সংকীর্ণতা আমাদের ব্যথিত করে। ইউনিফরমিটি বলতে বুঝানো হয়, কোন কিছু একই রকম হবে বা সমমনা হবে; তা ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি বা যে কোন ক্ষেত্রেই হতে পারে। ধর্মের ক্ষেত্রে যা দাঁড়ায় তা হল, আমার দেশে কেবল আমার ধর্ম থাকবে, আমার ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করতে হবে, অন্য ধর্ম থাকতে পারবে না। এই ধরণের মানসিকতার কারণে বহু দেশ থেকে বহু ধর্ম, ভাষা, স্থাপনা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। এই যে ভিন্নতার প্রতি প্রতিহিংসা বা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব তা কিন্তু কোনভাবেই কাম্য নয়। কেননা, এ কারণে অন্যদের তাড়ানো হোক, মেরে ফেলা হোক, জোর করে ধর্মান্তরিত করা হোক- এই ধরণের মানসিকতার প্রতিফলন প্রায়ইশ দেখা যায়।

আমরা অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথীদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেই। এই ফুলের তোড়া কিন্তু একই ধরণের বা সমজাতীয় ফুল দিয়ে তৈরি নয়। এটি বিভিন্ন ফুল ও পাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ফলে বিভিন্ন রংয়ের ফুল ও পাতার সমন্বয়ে সেটি সুন্দর হয়ে ওঠে। আরেকটি উদাহরণ দেই: আমরা বিভিন্ন রং ও গন্ধের ফুল দিয়ে ফুলদানী সাজিয়ে ঘরে রেখে দেই। তখন সেটি ঘরের সৌন্দর্য যেমন বাড়িয়ে তোলে, তেমনি ফুলের সৌরভে ঘর মোহময় হয়ে ওঠে। তবে সেই ফুলাদানী যদি একই রংয়ের ফুল দিয়ে সাজানো হয়, তবে সেটি কিন্তু ততোটা সুন্দর লাগে না। তার মানে প্রতিটি ফুলই সুন্দর হলেও ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলো ফুল একত্রিত করা হলে তার সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়ে যায়।

ভূপ্রকৃতিও সবখানে এক রকম নয়। কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্র ও গিরিখাদ রয়েছে। এই ভিন্নতা দেখেই তো মানুষ মুগ্ধ হয়! নইলে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে সমতলের মানুষ পাহাড়-পর্বত, গিরিখাদ সমুদ্র দেখতে যেতো না, আবার পাহাড়ের মানুষ সমতলে আসতো না। পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষ সমতলে এসে মাইলের পর মাইল সমতল ভূমি দেখে যেমন আশ্চর্য হয়, তেমনি সমতলের মানুষ পাহাড়ের পর উচু উচু পাহাড়ের সারি দেখে অভিভূত হয়। অথচ যে ব্যক্তি পাহাড়ে জীবন পার করে দিচ্ছে, তার কাছে পাহাড় বা পাহাড়ের সারি একেবারেই সাধারণ ব্যাপার!

সঙ্গীত বা গান বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও কণ্ঠের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। কেউ যদি হারমোনিয়াম দিয়ে কেবল গানই গেয়ে চলতো, তবলা বা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র না বাজাতো তবে কেমন হতো? কিংবা কেউ যদি কেবল তবলাই বাজিয়ে যেতো, অন্য কেউ গান না গাইতো, হারমোনিয়াম, গীটার, বেহালা, ড্রামস্ প্রভৃতি না বাজাতো তাহলেইবা কেমন হতো? নিশ্চয় তখন সেটি চিত্তাকর্ষক হতো না বা মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র দিয়েই একটি সঙ্গীত পরিপূর্ণতা পায়, আর তখন তা শুনে আমরা মুগ্ধ হই।

তাহলে মানুষের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা দেখে মানুষ কেন মুগ্ধ হবে না? কেন মানুষ একই জাতি, ধর্ম বা বর্ণের মানুষ দেখতে পছন্দ করবে? কেন অন্যের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হবে না? প্রকৃতপক্ষে, হিংসা বা শত্রুতা তো কখনও শান্তির উপায় বা পথ হতে পারে না। যুগে যুগে ভিন্নতার প্রতি এই অসহনশীলতার কারণেই তো মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কাজেই, প্রকৃতি থেকেই কি আমরা শিক্ষা নিতে পারি না যে, বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মিলেমিশে থাকার সৌন্দর্য ও আনন্দই অসাধারণ ব্যাপার! আর সেভাবেই তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে! কারণ বৈচিত্র্যতার মধ্যেই তো সত্যিকার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভৌগলিক সীমানার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ যখন মানুষ হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলবে, তখনই তো মর্ত্যজগত পরিণত হবে স্বর্গে। আমরা তো তেমন পৃথিবীই চাই॥

আন্তঃপ্রজন্ম, শিক্ষা ও শ্রমের সাথে সংলাপ; শান্তি স্থায়ীকরণের হাতিয়ারস্বরূপ

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

"আহা, কত না সুন্দর পাহাড়-পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে সুসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে, মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে, ঘোষণা করে পরিত্রাণ *(ইসাইয়া ৫২:৭)*।" প্রবক্তা ইসাইয়া সেই সময়ের বন্দি, নিপীড়িত, ক্লান্ত, মর্যাদাহীন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষের কাছে আশার বাণী ঘোষণা করেন। সেই সময়ে ইস্রায়েলের মানুষের কাছে শান্তির দূতের আগমনের অর্থ ছিলো ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপ থেকে পুনর্জন্মের প্রতিশ্রুতি, একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা।

আজকের সমাজ ও জীবন বাস্তবতায়, মানুষের জীবন থেকে শান্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, যদিও আমরা সকলে পরস্পরের জীবনের সাথে আন্তঃসম্পর্কে জড়িত। শান্তির খোঁজে জাতিতে-জাতিতে সংলাপের বহু উদ্যোগ গ্রহণের পরেও যুদ্ধ ও সংঘাতের তীব্রতা বাড়ছে। যখন মানুষের মাঝে ক্ষুধা-তৃষ্ণার পাশাপাশি মহামারি ধরণের রোগ-বালাই হুমকীস্বরূপ, পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাবগুলো তীব্রতর হচ্ছে তখন সংযত সহভাগিতার পরিবর্তে স্বার্থবাদের ওপর ভিত্তি করে চলছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। যেন, প্রাচীনকালের সেই প্রবক্তাদের সময়ের মতো, ন্যায় ও শান্তির জন্য দীন-দরিদ্র ও এই ধরিত্রী-মাতা নিয়ত কান্না করছে।

সর্বযুগেই শান্তি হলো স্রষ্টার দেওয়া উপহার এবং মানুষের সহভাগিতার ফসল। তাই বলা যায় শান্তি একটি "স্থাপত্য", বা "শিল্প" যেটিতে অনেকের অংশগ্রহণ রয়েছে। তাই শান্তি ব্যক্তি ও পরিবারের সম্পর্কের হৃদয় থেকে শুরু করা একটি প্রক্রিয়া যা সমাজ, পরিবেশ, মানুষ ও জাতির সাথে সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়।

শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ব শান্তি দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে তাঁর বাণীতে তিনটি অপরিহার্য উপাদানের প্রস্তাব করেন। প্রথমত, সহভাগিতার জন্য আন্তঃপ্রজন্মীয় সংলাপ। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও উন্নয়নের উপাদান হিসেবে শিক্ষা। পরিশেষে, মানুষের মর্যাদাপূর্ণ উপলব্ধির উপায় হিসেবে শ্রম। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই সামাজিক উপাদানগুলোর বাস্তবায়ন ছাড়া আসলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই ভেস্তে যেতে পারে, অস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী হয়ে যেতে পারে, এমনকি প্রচেষ্টাগুলো অমূলক বনে যেতে পারে বৈকি।

আন্তঃপ্রজন্মীয় সংলাপ

সারা বিশ্ব আজ অতিক্রম করছে একটি অস্থির, অপ্রত্যাশিত মহামারি ও সঙ্কটময় কাল, যেখানে তৈরি হয়েছে মহাসাগরসম সমস্যা। "কিছু মানুষ বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তারা আশ্রয় নিচ্ছে নিজেদের তৈরি বলয়ের ছোট্ট এক পৃথিবীতে; অন্যেরা ধ্বংসাত্মক সহিংসতার সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। তবুও এই স্বার্থপর উদাসীনতা এবং হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার মাঝেও আর একটি সম্ভাব্য বিকল্প টিকে আছে: সেটি হলো আন্তঃপ্রজন্ম সংলাপ।" সৎ উদ্দেশে সঠিক ও ইতিবাচক মতবিনিময় পরস্পরের মধ্যে আস্থার জায়গাটি দাবী করে। পরস্পরের সাথে এই আস্থার জায়গাটি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি জানা আমাদের আশু প্রয়োজন। কোভিড-১৯ সহ স্বাস্থ্য সঙ্কটগুলো আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা (দূরত্ব) এবং আত্ম শোষণের প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হতাশায় বয়স্কদের মধ্যে সৃষ্ট একাকিত্ব ও অসহায়ত্ব যুবা সমাজকেও সংক্রমিত করেছে। এই সঙ্কটকালটি বেদনাদায়ক হলেও মানুষের মধ্যকার ভালো বিষয়গুলোকেও টেনে বের করে এনেছে। মহামারিকালে বিশ্ব-মানবের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহভাগিতা ও সংহতির দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। সংলাপের মাধ্যমে একে-অপরকে শোনা, ভিন্ন মতাদর্শ সহভাগিতার মাধ্যমে সমঝোতায় এসে একসাথে পথ চলার অন্তর্ভূক্তি হয়েছে। প্রজন্মের মধ্যে সংলাপের উৎকর্ষের মাধ্যমে সহভাগী ও স্থায়ী শান্তির বীজ বপনের লক্ষ্যে দ্বন্দ্ব ও অবহেলার কঠিন ও অনুর্বর ভূমি গুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কযুক্ত।

নতুন প্রজন্ম ছুটছে প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক অর্জনের পেছনে, যেখানে তাদের প্রয়োজন প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা শোনা, অথচ তারা প্রবীণদের সেকেলে তকমা দিয়ে অবজ্ঞার চোখে দেখছে। অন্যদিকে, প্রবীণদেরও প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তিসহ নতুন প্রজন্মকে সাহায্য, সমর্থন, স্নেহ, সৃজনশীলতা এবং নিজেদের মধ্যেও গতিশীলতা আনা। এই দুটির মধ্যে চলছে চরম দ্বন্দ্ব। ভার্চুয়াল জগত এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উপার্জন প্রক্রিয়া অনেকাংশে নতুন প্রজন্মকে সামাজিকতা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে টেনে বের করে নিয়েছে। তারা বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এর প্রয়োজনীয়তা, উপকারীতা ও সঠিকতা প্রমাণ করায় দক্ষ হয়ে ওঠেছে। একইসাথে সংখ্যায় বহু আছে যারা পূর্ণভাবে নতুন মতবাদ ও প্রযুক্তিতে নির্ভরশীল (আসক্ত) হয়ে পড়ছে। যার কারণে জীবনের প্রত্যাশিত স্বাভাবিকতা লোপ পাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে ব্যক্তিক ও পারিবারিক; অবশেষে সামাজিক শান্তি। এমতাবস্থায় এই সঙ্কটগুলো মোকাবেলার জন্য আন্তঃপ্রজন্মীয় সংলাপ জরুরী।

সমাজে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য, সামাজিক অস্থিরতা দূর করে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তঃপ্রজন্মীয় সংলাপ একটি সুস্থ সংস্কৃতির অবতারণা করবে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সমাজে নিজস্ব ও তাৎক্ষণিক স্বার্থগুলো ত্যাগ করে একে অপরের জন্য জায়গা করে দেবার মানসিকতা জাগবে। কমবে দ্বন্দ্ব এবং ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি যা রূপ নিবে স্থায়ীত্বে। পারস্পরিক দূরত্বে নয় সহভাগিতার মনোভাব নিয়ে কাছাকাছি এসে নিয়ত প্রক্রিয়াটি চলমান রাখতেই হবে।

শিকড় ছাড়া গাছ ফলবতী হতে পারে না, গাছের উপরিভাগে পাতা-লতা, ফুল-ফল হয় বলে এককভাবে তাদের গুরুত্ব দিলে যেমন ভুল করা হবে; ঠিক তেমনি সামাজিক বিষয়টি। অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে যেমন চলবে না, বর্তমানে মজে গেলেও ঠিক হবে না। নবীন-প্রবীণ, অতীত-বর্তমান সকলের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা একটি সমন্বিত শান্তিপূর্ণ আগামীর স্বপ্ন দেখতে পারি। বর্তমানে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক জটিল সমস্যাগুলো মোকাবেলার জন্য সকল ইউনিটে, সহভাগিতামূলক জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এতে দূর হতে পারে প্রলয়ংকরী ঝড়ের মত আসা অস্থিরতা, স্থাপিত হতে পারে স্থায়ী শান্তি। তাই আন্তঃপ্রজন্মীয় সংলাপ অতীব জরুরী। বিশেষ করে যান্ত্রিকতার চাপে পরিবারে একে-অপরের কাছে থেকেও যে মনোঃদূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে তা ভয়ানক, সবাই তাকিয়ে থাকি যার-যার ডিভাইসের দিকে!

এই বিশ্বটা আমাদের সকলের জন্য বসতভিটা। প্রতিটি প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দায়গ্রস্ত, যে দায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অপেক্ষাকৃত উন্নত বাসযোগ্য পৃথিবী হস্তান্তরের মাধ্যমে শোধ করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশতো বটেই, পাশাপাশি নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশগত সঙ্কট থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবেলায় নজরদারী আরো জরুরী। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিক নতুন একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে, যেখানে সকলে প্রকৃতি ও পরিবেশ তথা সৃষ্টির যত্ন, বৃদ্ধি, সুরক্ষায় মনোযোগী হবে।

একইসাথে নৈতিক ও সামাজিক সর্বজনীন এবং আবশ্যিক মানবিক মূল্যবোধগুলো চর্চা, বিতরণ ও বিকাশে যত্নশীল হওয়া সময়ের দাবী। তাই একসাথে স্থায়ী শান্তির পথ তৈরি করতে চাইলে শিক্ষা ও শ্রমকে উপেক্ষা করা যাবে না।

শান্তির চালক হিসেবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বিশ্বব্যাপি ইদানিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ কমে গেছে। মানুষ এটিকে বুনিয়াদ হিসেবে না দেখে ব্যয় হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। আসলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই কিন্তু মানুষের সমন্বিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রধান বাহন। এরা মানুষকে দিনে-দিনে আরো মুক্ত ও দায়িত্বশীল করে তোলে এবং শান্তি সৃষ্টি, রক্ষা ও সম্প্রসারণে অপরিহার্য। এককথায় শিক্ষা রচনা করে আশা, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিসম্পন্ন একটি সুসংহত সমাজের মজবুত ভিত্তি। অন্যদিকে, সামরিক ব্যয় দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে, যা আরো বাড়বে বলে ধারণা। এখনই সময় আরো ভেবে দেখার, সমাজে সামরিক খরচ (অস্ত্রের ব্যয়) আনুপাতিক হারে কমিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাড়ানো। যাতে করে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে সত্যিকারের প্রক্রিয়াটি অগ্রসরমান হবে, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল, অবকাঠামোসহ ধরিত্রী-মাতার যত্ন নিতে আর্থিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো আরো মনোযোগী হতে পারবে। বিশ্ব-পরিস্থিতির সাথে আমাদের পরিবারগুলোও অনেক ক্ষেত্রে মনের অজান্তে, নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দের চেয়েও শৌখিন, বিলাসী পণ্য-দ্রব্য ও পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। অবশেষে নিজের সন্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজেকে ব্যর্থ মনে করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আশা ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ এবং ধরিত্রী-মাতার যত্নের সংস্কৃতিকে উন্নীত করার বৃহত্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক বিভাজন এবং অদায়িত্বশীল সামাজিক সংগঠনগুলোর সীমাবদ্ধতা ডিঙ্গিয়ে পরস্পরের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার একটি নীরব ভাষা হয়ে উঠতে পারে। প্রথমে শিক্ষার মাধ্যমে একটি দেশে তার জনপ্রিয় সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি, শৈল্পিক সংস্কৃতি, যুবা-সংস্কৃতি, প্রযুক্তিগত সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও গণ-মাধ্যম সংস্কৃতি ইত্যাদি সমৃদ্ধশীল সংস্কৃতিক উপাদনগুলোর মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ ঘটানো: তারপর, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা একটি নতুন সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অপরিহার্য, যা মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলি, ধর্ম, সরকার এবং সমগ্র মানব পরিবারকে নারী-পুরুষের পরিপক্ক ও সুসমন্বিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিবে। এধরণের একটি সুসমন্বিত ও অবিচ্ছেদ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর কেন্দ্রীভূত স্থায়ী শান্তি এবং উন্নয়নের মডেল যা অনুসারে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং মানুষের সাথে প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ (ধরিত্রী মাতার) সুন্দর আগামীর সুসম্পর্ক বিরাজ করবে।

আমাদের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা প্রশিক্ষণের স্থানগুলোতে (পরিবার, সমাজ, ও অপরাপর সকল প্রতিষ্ঠান) নতুন ও তরুণ প্রজন্মকে মানুষে-মানুষে, মানুষে-প্রযুক্তিতে, মানুষে-প্রয়োজনে এবং মানুষে-ধরিত্রী মাতার সাথে টেকসই সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ বাড়ানো, অশান্তি সৃষ্টিকারী ঝনঝনানো অস্ত্র ও সামরিক ব্যয় কমানো এবং নতুন প্রজন্মকে শ্রম বাজারের উপযুক্ত দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে তৈরির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরী।

শান্তি নিশ্চায়নকারী শ্রম ও শ্রমিক তৈরি

শান্তিকামী শ্রমিক ও তার শ্রম শান্তি স্থাপনে ও তা টিকিয়ে রাখার একটি অপরিহার্য উপাদান। আমরা সর্বদাই কারো জন্য বা কারো সাথে কাজ করি, অর্থাৎ যে কোন কাজই ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বে এবং সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য। তাই শান্তি স্থাপনের জন্য স্ব-বিনিয়োগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা শান্তি স্থাপনের একটি উপহারের প্রতিশ্রুতির অভিব্যক্তি। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরণের কর্ম পরিবেশ আমাদের ধরিত্রীকে আরও বাসযোগ্য ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে সক্ষমতা দান করে।

করোনার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের বৈশ্বিক শ্রমবাজারকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে, শ্রমবাজার হারিয়েছে তার স্বাভাবিক গতি। অনেক কর্মী কাজ হারিয়েছে, আর কর্মপ্রত্যাশী প্রস্তুত নতুন প্রজন্ম রয়ে গেছে বেকার। লাখো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির কিংবা ব্যর্থ হয়ে পড়েছে, বেড়েছে সামাজিক হতাশা। চাকুরী বাজারে প্রবেশপ্রার্থী যুবারা এবং বেকার প্রাপ্তবয়স্করা সম্মুখিন হয়েছে অন্ধকার সম্ভাবনার। অভিবাসী শ্রমিকরা অর্থনৈতিক সঙ্কটে প্রত্যাবর্তন করছে ধ্বংসাত্মক আগামীর দিকে। পরিবারগুলো বাস করছে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে, অভাবের তাড়নায় অন্যায়ভাবে তারা নানাবিধ দাসত্বের শিকার হচ্ছে যা থেকে উত্তরণের কোন কল্যাণমূখী ব্যবস্থা নেই। বিশ্বে আজ কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সীমিতভাবে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আছে। দিকে-দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে সহিংসতা, সংগঠিত হচ্ছে নানাবিধ অপরাধ, যা মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে, অর্থনীতিকে করছে বিষাক্ত এবং সর্বজনীন মানব কল্যাণ বাঁধাগ্রস্ত করছে। এই অবস্থার নিরসনের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি একমাত্র সমাধান যেখানে কর্ম ও কর্মীর অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি নিশ্চায়ন হতে পারে।

শ্রমিকের শ্রম নিশ্চায়ন মূলত মানুষে-মানুষে ন্যায়-বিচার ও সংহতি গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই কারণে, আধুনিক প্রযুক্তিকে কোনভাবেই মানুষের স্থানে (পরিবর্তে) প্রতিস্থাপন করা ঠিক হবে না, যদি তাই হয় তবে তা হবে মানবতার জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিকে নয় কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে মানুষকে, এটি প্রতিটি মানুষের অধিকার, যেখানে সে জীবনের অর্থ, নিয়ত বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, মানব জীবনের উন্নয়ন, মানব মর্যাদা এবং অবশেষে জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পায়। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জ্ঞান বা ধারণা ও প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে এমন সমাধান ও অবস্থা তৈরি করতে হবে যা কর্মক্ষম প্রতিটি মানুষকে তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবার ও সামগ্রিকভাবে সমাজ জীবনে মানব কল্যাণে নিজ-নিজ অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। সামাজিক স্থায়ী শান্তির বীজ বুননের জন্য উদ্যোক্তা ও শ্রমিককে সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধকে জাগ্রত করতে হবে যা সমগ্র স্তরে শ্রমিকের মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করবে। আগামীর/নতুন প্রজন্ম যতই তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটিতে সচেতন হবে মানবিক মর্যদা ততই টেকসই হবার সম্ভাবনা জাগবে। এভাবেই বর্তমান প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সামাজিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হবে শান্তি। যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

লাগামহীন মুনাফার লোভে স্বেচ্ছাচারী কারবার, শ্রমিককে তার উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ, মর্যাদা ও পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করার চর্চা, স্বল্প পারিশ্রমিকে অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে তাকে নানাভাবে জিম্মি করে চাতুর্যপূর্ণ শ্রম আদায়, প্রকৃত মালিককে/উৎপাদনকারীকে প্রতারণা করে মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণহীন দৌরাত্ব তদোপরি এসব নিয়মতান্ত্রিকভাবে তদারকীতে রাজনৈতিক উদাসীনতা শ্রমিক তথা মানব সমাজে বর্তমানে অস্থিরতা, অভাব, মর্যাদাহীনতা ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে ব্যক্তি, পরিবার সমাজ তথা বিশ্বের শান্তির স্থায়িত্বে কুঠাঘাত করছে।

অবশেষে: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস জোরালোভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, এখন আমরা করোনাঘাত থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার চেষ্টায় আছি, বিশেষ করে শিক্ষা, সুরক্ষা, মানুষের অধিকার সুরক্ষা, উদারভাবে একে অপরের জন্য চিকিৎসা সরবরাহ, পরিবারে রোগাক্রান্তদের যত্ন, তাদের সাথে সংলাপ করা, কর্ম হারানো ও দরিদ্রদের পাশে থাকা এই সুন্দর কাজগুলো চালিয়ে যেতে হবে। তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানান, আমরা যেন সাহস ও সৃজনশীলতার সাথে আন্তঃপ্রজন্মীয় সংলাপ, শিক্ষা ও শ্রমের সাথে সংলাপের পথ ধরে চলি। তবেই আমাদের আবাসভূমি এই বিশ্ব-ধরীত্রিটি হবে টেকসই শান্তির নিবাস ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

৫৫ তম বিশ্ব শান্তি দিবস (২০২২) উপলক্ষ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী। ভাটিকান, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১॥

স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মাধ্যম সংলাপ

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

আজ সকালে মেজদির পাঠানো একটি মেসেজ পড়তে পড়তে আমার খুব ভাল লাগলো। বিষয়টি ছিল একটি বাস্তব জীবনের কাহিনী যা খুবই সুন্দর এবং শিক্ষণীয় বটে। তাই মনে করলাম বিষয়টি আপনাদের সাথে সহভাগিতা করলেও মন্দ হবে না! যাই হোক, এর বিষয়বস্তুটা ছিল এরূপ -"একটি ঘরে চারটি মোমবাতি জ্বলছিল, প্রথম মোমবাতিটি বলল, "আমি শান্তি"- বেশীক্ষণ থাকি না। এই বলে মোমবাতিটি নিভে গেল। তখন দ্বিতীয় মোমবাতিটি বলে উঠল, "আমি বিশ্বাস"- যেখানে শান্তি নেই আমিও সেখানে থাকতে পারবো না। এই বলে দ্বিতীয়টিও নিভে গেল। এবার তৃতীয় মোমবাতিটি বলল, "আমি ভালবাসা"- যেখানে শান্তি আর বিশ্বাস নেই সেখানে আমার থাকা অসম্ভব। এই বলে সেও নিভে গেল। এবার একটি ছোট্ট ছেলে ঘরটিতে প্রবেশ করল...দেখলো চারটি মোমবাতির মধ্যে তিনটি নিভে গেছে আর একটি মিটমিট করে জ্বলছে। তখন ছোট্ট ছেলেটি চতুর্থ মোমবাতির কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করল –তুমি কেন জ্বলছ? তুমিও তো নিভে যেতে পারতে...! চতুর্থ মোমবাতিটি তখন বলল, "আমি আশা" আমি সব সময় থাকি। এখন তুমি চাইলে আমাকে দিয়ে এই তিনটিকেও জ্বালিয়ে তুলতে পারো অর্থাৎ শান্তি, বিশ্বাস আর ভালবাসাকে ফিরিয়ে আনতে পারো। আশাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে (সংরক্ষিত)!

দেখলেন তো চতুর্থ মোমবাতি ও ছোট্ট ছেলেটির মধ্যে কত সুন্দর সংলাপ যার ফলস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেল সমস্যা সমাধানের কত সহজ একটি পথ! হ্যাঁ, সংলাপই পারে অনেক সমস্যার সমাধান দিতে। তাই একা একা হতাশা-নিরাশায় ভুগে মরার চেয়ে যদি কারোর সাথে এমনিভাবে সংলাপ করি তবে অবশ্যই আমরা আনন্দ নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকতে পারবো। আর তখনই আমাদের মাঝে বিরাজ করবে ঐশশান্তি, পরস্পরের প্রতি থাকবে বিশ্বাস, ভালবাসা ও আশা! তবে এর জন্য পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। পরিবারেই তা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ এখানে আমরা যদি পিতামাতা, সন্তান ও অন্যান্য যারা থাকে তারা যদি প্রতিদিন একসাথে প্রার্থনা করি, খাওয়া-দাওয়া করি, সবকিছু সবার সাথে আলোচনা করে করি, পরস্পরের সাথে সহভাগিতা ও সহযোগিতা করি, অন্যদেরকে বুঝার চেষ্টা করি বিশেষভাবে কেউ যদি অসুস্থ থাকে এবং সবাই সবার মঙ্গল চিন্তা করি তবেই কিন্তু সেখানে নেমে আসে পরম শান্তি! বিরাজ করবে একটি বাসযোগ্য সুন্দর পরিবেশ। তবে আমার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা এই যে, এসবের পিছনে সংলাপের গুরুত্বটাই সবচেয়ে বেশী।

হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে সংলাপ আবার কি! তবে সাধারণত সংলাপ বলতে আমরা বুঝি কারো সাথে কথোপকথন বা মতবিনিময়। আবার সংলাপ বলতে আমরা কারো সাথে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করা বা গল্প করাকেও বুঝে থাকি। অন্যদিকে পরিবারে নানাবিধ সমস্যা থাকতেই পারে। আর তা সমাধানের জন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা আত্মীয় পরিজনের সাথে যোগাযোগ করে ও তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে পর অবশ্যই সেই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় খুঁজে বের করা যেমন সহজ হয় তেমনি সমস্যা সমাধানের ফলে নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে হতাশা, নিরাশা, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি কমে সেখানে নেমে আসে এক প্রশান্তি! তবে আমি যদি সমস্যাকে বড় করে দেখি এবং নিজের মধ্যে গোপন রাখি তবে কখনো সমাধানের পথ খুঁজে পাবো না। সেখানে শান্তিও আসবে না। তাই নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সংলাপের দ্বারাই স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব। কেননা জগতে এমন কিছু নেই যা একেবারেই অসম্ভব। সে কারণেই সংকল্প নিয়ে আমরা সংলাপে এগিয়ে যাবো এবং দেখবো সাফল্য আসবেই আসবে। তবে সংলাপের ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগটা কাউকে না কাউকে গ্রহণ করতেই হবে। কেননা যিশু বলেন- "শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা– তারাই পরমেশ্বরের সন্তান ব'লে পরিচিত হবে *(মথি ৫:৯)*।"

সংলাপের পাশাপাশি শান্তি স্থাপনের জন্য আরও কয়েকটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা ভাল। আর সেগুলো হল-

১। জীবনে কাকে কোন সময় কাজে লাগবে সেটা কেউ বলতে পারবে না। তাই সবার সাথে আমরা ভাল ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকবো। অর্থাৎ অন্যের কাছ থেকে আমি যেমন ব্যবহার আশা করি অন্যের সাথে ঠিক তেমন ব্যবহারের মাধ্যমেই সংলাপ করবো। দেখবো জীবন অনেক সুন্দর ও শান্তিময়।

২। কথায় বলে দুষ্ট লোকের ব্রেইন আর সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন- এ দুটি কখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। ভিতরে ময়লা থেকেই যায়। ঠিক একইভাবে আমরা দেখি যে পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের লোক অনেক সময় থাকে। তাই শান্তি রক্ষার জন্য তাদের সাথে সংলাপ করা একান্ত আবশ্যক।

৩। আবার দেখি যে এই পৃথিবীতে নিখুঁত আমরা কেউ নই, তাই অন্যের সমালোচনা না করে নিজের সমালোচনা করা ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন এনে শান্তিতে বসবাস করাটাই অধিকতর শ্রেয় ও সর্বোত্তম।

৪। অন্যদিকে আমরা মনে রাখবো যে গৃহের শান্তি স্বর্গের শান্তির চেয়ে কোন দিক দিয়েই কম নয়। তাই প্রথমে নিজ পরিবারে সংলাপের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে আমরা ব্রতী হবো। স্বয়ং খ্রিস্টই হলেন আমাদের মধ্যে শান্তির বন্ধন। প্রতিটি গৃহের অদৃশ্য কর্তা তিনি। তাই যার গৃহে শান্তি বজায় থাকে ত্রিত্ব-পরমেশ্বর তাকে ভালবাসেন ।

৫। শান্তির প্রকাশ সবসময় সুন্দর ও সহজ হয়। অন্যের জীবন ও পথচলা আনন্দদায়ক হয়। তাই আমরা হয়ে উঠবো একেকজন শান্তির দূত! নিজে শান্তিতে থাকবো অন্যকেও শান্তিতে থাকতে দিবো।

৬। তবে আজ প্রশ্ন, "কোথায় শান্তির পথ"– উত্তর আসে হ্যাঁ, যিশু নিজেই তো সেই শান্তিরাজ, যার আগমন প্রবক্তারা ঘোষণা করেছিলেন *(ইসাইয়া ৯:২-৭)*। "যারা তাঁকে গ্রহণ করে, তিনি তাদের দিয়ে থাকেন ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার *(যোহন ১:১২)* তাদেরই অন্তরে নামে সেই প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক শান্তি।" তাই আজ পরম পিতার কাছে আমাদের সবার প্রার্থনা- "জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে!"

৭। শান্তি যেখানে সেখানে স্বয়ং খ্রিস্ট উপস্থিত থাকেন। তিনি বলেন-"আমি তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি ; অবশ্য এ সংসার যে-ভাবে শান্তি দেয়, সেইভাবে আমি তোমাদের তা দিয়ে যাচ্ছি না *(যোহন ১৪:২৭)*।" তাই প্রকৃত শান্তি

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

স্মৃতিতে অম্লান তোমরা

প্রয়াত মৌ গোমেজ

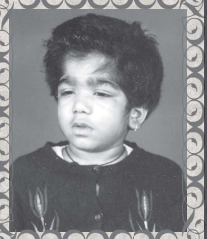

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জুন ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

১৫তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তোমাকে মনে পড়ে, যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে

অতি আদরের মা মৌ,

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই কষ্টেভরা বেদনার দিন ১২ জুন, যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিলে পরম পিতার কাছে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করে গেলে। কি করে ভুলব তোমাকে? বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি করুণাময় পিতা পরমেশ্বর যেন স্বর্গের অনন্ত সুখ, শান্তি দান করেন তোমার আত্মার কল্যাণে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ (আন্টি)
বাবা : রমেশ গোমেজ
মা : কাকলী গোমেজ

বিজ্ঞ/১৬৬/২২

প্রয়াত রবিন গোমেজ

জন্ম : ২১ জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৯ জুন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : মাটিভাঙ্গা, পটুয়াখালী (পাদ্রীশিবপুর)

বাবা,

দেখতে দেখতে ২৭টি বছর কেটে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে স্থান করে নিয়েছ। আজও আমরা বেদনাবিধূর হৃদয়ে তোমাকে স্মরণ করছি বাবা। স্মৃতির মণিকোঠায় জমানো তোমার স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের কাঁদায়। তুমি যে আমাদের মাঝে নেই, এই নির্মম সত্যটি মেনে নিতে এখনো বড়ই কষ্ট হয় বাবা। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা অনুভব করি। তোমার স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে সারা জীবন তোমার আদরের সন্তানদের হৃদয়ে। তোমাকে আমরা কোনদিন ভুলব না বাবা। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শ, নম্রতা, ত্যাগ ও কর্মময় জীবন অনুসরণপূর্বক সকল কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করি। সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মারীয়া গোমেজ
ঢাকা

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র অফিস এবং জুনিয়র গার্লস্ হাইস্কুলে নিম্নলিখিত পদে আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

পদের নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	১ টি	• যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী ও বিএড থাকতে হবে। • বয়স ৩০-৪০ বছর। • শিক্ষকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার দক্ষতা (MS word, Excel, Power Point, Internet), দলগত কাজের দক্ষতা, পরিচালনার দক্ষতা • নারী প্রার্থী আবশ্যক।
সহকারী শিক্ষক (মাধ্যমিক শাখা)	বাংলা-১টি আইসিটি- ১টি	• যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী ও বিএড থাকতে হবে। • বয়স ৩০-৪০ বছর। • শিক্ষকতায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার দক্ষতা (MS word, Excel, Power Point, Internet), দলগত কাজের দক্ষতা, পরিচালনার দক্ষতা। • নারী ও প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অফিস সহকারী	১ টি	• যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী হতে হবে। • MS word, Excel, Power Point, Internet জানতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • নারী ও মনিটরিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ।
৩. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ও আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে ।
৪. উক্ত পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র আগামী **২০ জুন ২০২২** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে **সাধারণ সম্পাদিকা, কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ, বাদুরতলা, কুমিল্লা** এই ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে ।

বিজ্ঞ/১৬৭/২২

পঞ্চাশত্তমী পর্বোৎসব

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

পবিত্র আত্মা ও খ্রিস্টমণ্ডলী ওতপ্রোতোভাবে সংযুক্ত। এজন্য খ্রিস্টমণ্ডলীতে পঞ্চাশত্তমী পর্বের গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য। তৎকালীন ইহুদী সমাজেও পঞ্চাশত্তমী পর্ব খুব জাঁকজমক সহকারে পালন করা হত। পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা অবরোহনের ফলেই বাণী প্রচারের এক নবজাগরণ ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এদিন শিষ্যদের বাণী প্রচারের কারণে ইহুদীরা মন পরিবর্তন করে যিশুখ্রিস্টকে হৃদয়ে ধারণ করে। এভাবেই পঞ্চাশত্তমী মহাপর্বদিনে মণ্ডলীর শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনে মণ্ডলী বৃহৎ আকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব: পঞ্চাশত্তমী পর্ব নাম করণের কারণ হল নিস্তার বা উদ্ধার পর্বের ঠিক পঞ্চাশ দিন পর এই পর্ব পালন করা হয়। "লেবীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, ইহুদী জাতির জন্য ঈশ্বর বেশ কয়েকটি পর্ব স্থির করেছিলেন। তবে উদ্ধারপর্ব বা নিস্তার পর্ব তারা বেশ জাকজমক সহকারে পালন করত। আর এই পর্বের ঠিক পঞ্চাশ দিন পর তারা পঞ্চাশত্তমী পর্ব পালন করত। এ পঞ্চাশত্তমীর পর্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট ছিল। ইহুদীরা এদিন স্মরণ করত সিনাই পর্বতে মোশীর নিকট ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা প্রদানের কথা। অর্থাৎ সিনাই পর্বতে ঈশ্বর ও ইহুদী জাতির মধ্যে যে মিলন সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল তা এ দিনে তারা স্মরণ করত। নব সন্ধিতে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান মহাপর্ব (নিস্তার মহাপর্ব) এর পঞ্চাশ দিন পর পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব পালিত হয়। এই পর্ব পবিত্র আত্মার অবতরণ মহাপর্ব নামেও পরিচিত।

পঞ্চাশত্তমী পর্বে পবিত্র আত্মার অবরোহন: প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের ঠিক পঞ্চাশ দিন পর পঞ্চাশত্তমী পর্ব দিনে শিষ্যরা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছিলেন। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে বাতাসের শব্দের মত একটি শব্দ আসল এবং যে ঘরে তারা ছিলেন সেই শব্দে ঘরটি পূর্ণ হয়ে গেল। শিষ্যরা দেখলেন যে, আগুনের জিহ্বার মত কি যেন ছড়িয়ে গেল এবং সেগুলো তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর বসল। এভাবে যিশুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে পঞ্চাশত্তমীর পর্ব দিনে আগুনের আকারে পবিত্র আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের উপর নেমে আসার পর, তাদের অন্তর অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস ও নির্ভীকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনুপ্রেরণাদায়ী পবিত্র আত্মার গুণে প্রেরিতশিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। প্রেরিতশিষ্যদের পালকীয় জীবনে দেখি যে, তাঁরা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলছে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কথা অনবরত সকলকে শুনাচ্ছে। বন্দি হয়ে যেখানে যিশুর কথা বলতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছিল সেই রাজ-দরবারে নির্ভয়ে যিশুর কথা বলছে। বন্দি কারাগার থেকে আশ্চর্যজনকভাবে বাইরে বেরিয়ে আসছে, মৃতদের জীবন দিচ্ছে। মূলত একমাত্র আত্মার শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে প্রেরিতশিষ্যগণ নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় এবং বিরামহীনভাবে কাছে ও দূরের জাতি-বিজাতি সকল মানুষের কাছে ঐশরাজ্যের মঙ্গলবার্তা প্রচার করেছে।

পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর চালিকাশক্তি: পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীর ও সমগ্র প্রেরণকর্মের মূল চালিকাশক্তি। প্রেরিতশিষ্যগণের মধ্যদিয়েই পবিত্র আত্মা কাজ করেছেন কিন্তু একই সময় যারা তাঁদের বাণী শুনেছেন তাদের মধ্যেও পবিত্র আত্মা সক্রিয় ছিলেন। তারই ক্রিয়ায় মঙ্গলসমাচার মানুষের হৃদয় ও মনে মূর্তিমান হয়েছে এবং যুগে যুগে তা বিস্তার লাভ করেছে। পবিত্র আত্মাই এই সব কিছুর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে আসছেন। যিশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের পর প্রেরিতশিষ্যগণ এমন এক শক্তিশালী অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যা তাদেরকে পুরোপুরিভাবে রূপান্তরিত করে দিল: এই অভিজ্ঞতা পবিত্র আত্মারই অবতরণের অভিজ্ঞতা। পবিত্র আত্মার আগমনে তাঁরা সাক্ষ্যদাতা ও প্রবক্তা হয়ে উঠলেন *(শিষ্য ১:৮; ২:১৭-১৮)*। পবিত্র আত্মা, সাহসীকতাপূর্ণ উদ্যমের সাথে যিশুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তাদেরকে সমর্থ করে তোলেন। পবিত্র আত্মা সমগ্র মণ্ডলীকে প্রেরণকর্মী করে তোলেন পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীবর্গকে একটি সমাজগঠনে তথা মণ্ডলী গঠনে পরিচালিত করেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুসারে অনুচ্ছেদ ১৮৩২ বলা হয়েছে, পরম আত্মার ফলসমূহ হল সেই সিদ্ধতা যা পবিত্র আত্মা শাশ্বত মহিমার প্রথম ফসল হিসেবে আমাদের মধ্যে গঠন করেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতরের প্রথম 'মঙ্গলবাণী' ঘোষণার পর যে ধর্মান্তর সংঘটিত হয় তার পরই প্রথম সমাজ রূপলাভ করে *(শিষ্য ২:৪২-৪৮; ৪:৩২-৩৫)*।

খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্মদিন: পঞ্চাশত্তমী পর্ব দিনকে খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্মদিন বলা হয়। কেননা পঞ্চাশত্তমী পর্বে পবিত্র আত্মা আগমনের ফলেই খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্ম বা সূচনা হয়। অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ পিতরের উপদেশ শুনে সেই দিন তিন হাজারের মত ইহুদী লোক দীক্ষার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে লাভ করেছিল এবং শিষ্যদের দলে যুক্ত হয়েছিল *(শিষ্যচরিত ২:১-৪৭)*। পবিত্র আত্মার সক্রিয় সহায়তায় প্রেরিতশিষ্যগণ মণ্ডলী স্থাপনে ও সমগ্র বিশ্বে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। যিশুর বাণী প্রচার করতে গিয়ে শিষ্যগণ নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। অনেকে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কোন প্রকার ভয় তাঁদের প্রতিহত করতে পারেনি; তাঁদের উদ্যমতাকে দমন করতে পারেনি; বাণী প্রচার করা থেকে তাঁদের নিবৃত করতে পারেনি। তাদের অন্তরে যিশুর সেই আদেশ "সুতরাং যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর *(মথি ২৮:১৯)*।"

পঞ্চাশত্তমী শুধু মহাপর্ব উৎসবই নয় বরং এটি একটি বর্তমান বাস্তবতা ও নিত্যদিনের চলমান প্রক্রিয়া। পঞ্চাশত্তমী পর্ব পবিত্র আত্মার আত্মিক শক্তিতে মণ্ডলীর শুভ সূচনা হয়, তেমনি ভাবে আজও পবিত্র আত্মার শক্তিতে মণ্ডলী প্রতিনিয়ত পবিত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 'পবিত্র আত্মা যে-ফসল ফলিয়ে তোলেন, তা হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা এবং আত্মসংযম' *(গালাতীয় ৫:২২-২৩)*। যিশু বলেছেন ফল দেখেই গাছ চেনা যায় *(মথি ৭:১৬-২০)*। "আমরা যখন পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জীবিত আছি, তখন আমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই এগিয়ে চলি *(গালাতীয় ৫:২৫)*।" পিতর যেভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন আমরাও যদি পবিত্র আত্মাকে আমাদের হৃদয়-মন্দিরে উন্মুক্ত করে স্বাগত জানাই ও পবিত্র আত্মাকে বাস করার জন্য আমাদের হৃদয়ে স্থান প্রস্তুত করি তাহলেও আমরাও এক নতুন মানুষ হয়ে উঠবো। পঞ্চাশত্তমীর ঐশশক্তি ও মহান জ্যোতি খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর সর্বদা বিরাজমান ও নিত্য অধিষ্ঠিত। একই শক্তি ও জ্যোতি সকল খ্রিস্টভক্তের মন-অন্তর উদ্ভাসিত করুক, নবায়িত করুক সমগ্র বিশ্বব্রহ্মণ্ডের রূপ।

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): মঙ্গলবার্তা, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

২. ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক (সম্পাদিত): কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০০০।

৩. স্পিজিয়ালে, ফা: আরতুরো পিমে: অদৃশ্য শক্তিশালী ও অন্তর্যামী পবিত্র আত্মা, উথুলী কাথলিক উপ-ধর্মপল্লী, ঢাকা, ২০০০।

৪. রোজারিও, অরুণ: "পঞ্চাশত্তমী পর্বের কথা", সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ১৯, ঢাকা, ১৯৯৬॥

সিনোডীয় মণ্ডলী: পবিত্র আত্মার বশে জীবন যাপন

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

সিনডীয় মণ্ডলী স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা যেন পবিত্র আত্মার কথা শ্রবণ করি। পবিত্র আত্মার বশে জীবন যাপন করি। তাঁর পরিচালনায় খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করি। পবিত্র আত্মাকে সুযোগ দেই কাজ করতে আমার জীবনে। পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যিশুকে বিশ্বাস করি, গ্রহণ করি ও তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করি। পঞ্চাশত্তমী পার্বণে আমাদের অনুধ্যানের বিষয় হলো কিভাবে পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে, আত্মার আলোকে আলোকিত হয়ে, আত্মায় পরিচালিত হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি? পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেন? পবিত্র আত্মার দান আমাদের জীবনে বিরাজিত তা কিভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি?

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রীয় ভাষাচিত্র

"সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন *(আদি ১:২)*। দাউদকে সামুয়েল অভিষেক করলেন আর সেই দিন হতে প্রভুর আত্মা দাউদের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। *(১ সামু ১৬: ১৩)*। প্রভুর আত্মা-প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভু ভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে *(ইসাইয়া ১১:২)*। "তাদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা *(শিষ্য ২:৪)*।" মারীয়া গর্ভবতী পবিত্র আত্মার প্রভাবেই *(মথি ১:১৮)*। মহাদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে আশ্বস্ত করে বললেন, পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, ... সেই পবিত্র জন ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত হবে *(লুক ১:৩৫)*। ঐশ আত্মা এক কপোতের মত নেমে আসছেন এবং তাঁর উপর অধিষ্ঠিত হচ্ছেন *(মথি ৩:১৬)*। সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন তিনি তোমাদের সবকিছু শিখিয়ে দেবেন *(যোহন ১৪:২৬)*। সেই পরম সহায়ক... তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার স্বপক্ষে সাক্ষী দিবেন। *(যোহন ১৫:২৬)*। পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া ঈশ্বরের ভালবাসা *(রোমীয় ৫:৫)*। প্রভুর আত্মা যিনি, তিনি সেখানে, সেখানেই স্বাধীনতা *(২ করি ৩:১৭)*। তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির *(১ করি ৬:১৯)*। ঐশ আত্মা আমাদের অন্তরঙ্গ সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে এই সত্যের সাক্ষী দিচ্ছেন যে, আমরা পরমেশ্বরের সন্তান *(রোমীয় ৮:১৫)*। "ঈশ্বরের সেই পরম আত্মা যিনি, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন *(১ করি ৩:১৬)*। পরমেশ্বরের আত্মা যিনি তিনি ছাড়া আর কেউই পরমেশ্বরের অন্তরের কথা জানতে পারে না *(১ করি ২:১১)*। পিতর আনানিয়াসকে বললেন, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে এমন মিথ্যা কথা বলতে পারলে? ... মানুষের কাছে নয় তুমি তো পরমেশ্বরের কাছেই মিথ্যা কথা বললে *(শিষ্যচরিত ৫:৩-৪)*।

পবিত্র আত্মার প্রেরণা না পেয়ে কেহই বলতে পারেনা যে 'যিশুই প্রভু' *(১ করি ১২:৩)*। একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি *(১ করি ১২:১৩)*। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দান বিচিত্র। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সকলের মঙ্গলের জন্য *(১ করি ১২:৭-১০)*। "সেই সত্যের আত্মার দ্বারাই তোমরা জানতে পারবে যে, আমি পিতার মধ্যে রয়েছি এবং তোমরা আমার মধ্যে আছে আর আমি তোমাদের মধ্যে আছি *(যোহন ১৪:২০)*।" মানুষ যেন পুণ্যপথে চলতে পারে সেজন্য পবিত্র আত্মা তাঁর অন্তর আলোকিত করেন, আর তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলেন প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সদয়ভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা ও আত্মসংমের *(গালাতীয় ৫:২২)* পুণ্য অনুভূতি।

বিশ্বাসী ভক্তের ৩টি বিষয় করণীয় পবিত্র আত্মার বিষয়ে

আত্মার প্রভাবে সঞ্জীবিত ভক্ত মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় হলো পবিত্র আত্মার নিন্দা না করা *(মার্ক ৩:২৯)*, তাঁকে দুঃখ না দেওয়া *(এফেসীয় ৪:৩০)*, তাঁর জ্বালানো প্রদীপ নিভিয়ে না দেওয়া *(১ম থেসালনীকীয় ৫:১৯)* এবং তাঁর বিরোধিতা না করা *(শিষ্যচরিত ৭:৫১)*।

উপসংহার

মণ্ডলীর প্রথম পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শ্রোতাগণ সাধু পিতরের প্রচারে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের তাহলে এখন কী করা উচিত? পিতর উত্তর দিলেন, তোমরা এখন মন ফেরাও এবং পাপের ক্ষমা পাবার জন্য প্রত্যেকেই যিশুখ্রিস্টের নামে দীক্ষীত হও। তাহলে তোমরা পাবে সেই ঐশদান স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে *(শিষ্যচরিত ২:৩৮)*। পবিত্র আত্মা আমাদের উপাসনায়, জীবনে বিশ্বাসে স্থান পেয়েছে। একটি অনুধ্যান: পবিত্র আত্মার কোন দানটি আমার জীবনে খুবই প্রয়োজন? ৯০

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

আশা রিটা রোজারিও

জন্ম : ১৮ মার্চ, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৫ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম : সূজাপুর, পো: নাগরী

থানা: কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর

9613 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland-20903, USA

দূর হতে আরও দূরে
নিখিলের আরও অন্তরালে;
জড়ায়ে রাখিলে আজও সবারে,
তোমার ভালবাসার মায়াজালে!!

বিজ্ঞ/১৬৫/২২

এই তো ভালোবাসা

রনেশ রবার্ট জেত্রা

অর্ক তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে এখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তার মা-বাবা তাকে খুব ভালোবাসে এবং আদর করে। সে তার পিতা মাতার বাধ্য থাকে এবং প্রতিদিন সকালে মায়ের সাথে গির্জায় যায়। অর্ক যে স্কুলে পড়াশুনা করে, সেখানে তার শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দও তাকে অনেক ভালোবাসে ও আদর যত্ন করে। কারণ অর্ক শিক্ষক শিক্ষিকাদের সর্বদা বাধ্য থেকে পড়াশুনায় ভালো ফলাফল করে থাকে। তার সাথে স্কুলে একই বেঞ্চে বসে ক্লাস করে তার একমাত্র বন্ধু পরেশ। সে অন্যান্য বন্ধুদের সাথেও ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু সে পরেশের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক তৈরি করেছে। পরেশ যদিও পড়াশুনায় তেমন একটা ভালো ফলাফল করতে পারে না। কারণ পরেশ বস্তিতে থাকার সুবাদে পড়াশুনা করার তেমন সুযোগ হয়ে ওঠে না আর ভালো পড়াশুনারও তেমন একটা ভালো পরিবেশও পায় না। কিন্তু পরেশ এমনিতে খুব ভালো ছেলে। আর্থিক অনটন থাকার কারণে তার স্কুলে যাওয়ার পোশাকটা ছিড়ে গেলেও সে তা সেলাই করে প্রতিদিন স্কুলে পড়ে আসে।

অর্ক একদিন তার মাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা মা, আমরা কিভাবে যিশুকে ভালোবাসব? তার মা অর্ককে প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমাদের ও গুরুজনদের বাধ্য থেকে, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার ও সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে। তাহলে তুমি যিশুকে ভালোবাসতে পারবে এবং যিশুও তোমাকে ভালোবাসবে।

অর্ক মায়ের কথা শুনে একদিন তার মাকে বলল, মা আমি আমার বন্ধু পরেশকে সাহায্য করব। তার কথায় তার মা তাকে বলল, তুমি তো তাকে সব সময় সাহায্য কর। কিন্তু অর্ক তার মাকে বলল, এখন থেকে আমি তার জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করব এবং পাশাপাশি তাকে পড়াশুনায়ও আগের চেয়ে বেশি সাহায্য করব। এমনকি পরীক্ষার শুরু হওয়ার মাস খানেক আগে পরেশকে অর্ক বাড়িতে নিয়ে আসে আর পড়াশুনার আদাজল খেয়ে লাগে। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো মোবাইলে গেমস খেলা বাদ দিয়ে ও টিফিনের টাকাগুলো জমিয়ে রেখে যতটুকু পারত সাহায্য করত। একদিন পরেশ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আর অর্ক খবর পেয়েই তার মাকে সঙ্গে করে নিয়ে পরেশের বাড়িতে চলে যায় আর পরেশকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। পরেশ ডাক্তারের ভালো চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে। সামনে তাদের সমাপনী পরীক্ষা। তাই তারা দুজন স্কুল শেষ করে বাসায় ফিরে আর পরীক্ষার প্রস্তুতি স্বরূপ পড়াশুনায় মন দেয়। যথাসময়ে তাদের পরীক্ষা এলো, তারা তাতে অংশগ্রহণ করল আর সুনামের সাথে ভালো ফলাফল করল। পরেশ পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে অর্ককে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং আনন্দের জোয়ার চোখের জলে তাকে বুঝিয়ে দিল। এখন তারা দুজনেই হোস্টেলে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। ভালো ফলাফলের জন্য পরেশ বৃত্তি পায় আর এখান থেকেই তার স্কুলের যাবতীয় খরচ চালায় এবং হোস্টেলের খরচ অর্কের বাবা-মা বহন করে। অন্যদিকে অর্কও তার পিতা-মাতার বহনকৃত খরচেই যাবতীয় কাজ সারে। এতে অর্কের পিতা-মাতা খুব আনন্দ পায় পরেশকে সাহায্য করতে পেরে। সবচেয়ে খুশি পায় অর্কের এইসব মানবীয় ভালোবাসাময় কর্মকাণ্ড দেখে।

প্রিয় বন্ধুরা, আমরাও অর্কের মতো যিশুকে ভালোবাসতে পারি এবং ভালোবাসা চর্চা করতে পারি। প্রতিদিন আমরাও যিশুকে ভালোবাসা উপহার দিতে পারি, আমাদের প্রতিবেশি ভাইবোন ও বন্ধুকে ভালোবেসে এবং সাহায্য সহযোগিতা করার মধ্যদিয়ে। বাবা মায়ের বাধ্য থেকে, মোবাইলে গেমস খেলা বাদ দিয়ে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার মধ্যদিয়ে। স্কুলে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে। প্রতিদিন টিফিন থেকে কিছু টাকা জমিয়ে রেখে, তা অভাবী ভাই বোনদের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে। এভাবেই আমরা ছোট শিশুরা যখন অর্কের মতো অন্য ভাই-বোন ও বন্ধুদেরকে ভালোবাসবো তখনেই আমরাও যিশুকে ভালোবাসতে পারবো। আর এ-ই মানবীয় কাজকেই বলা হয় হবে ভালোবাসা॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

২১জন নতুন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২৯ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার স্বর্গের রাণী প্রার্থনা শেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস জানান যে, আগামী ২৭ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তিনি নতুন কার্ডিনালদের প্রতিষ্ঠার জন্য কনসিসটরী ডাকছেন। পরবর্তী দু'দিন-সোম ও মঙ্গলবার (২৯-৩০ আগস্ট) তিনি সকল নতুন কার্ডিনালদের সাথে সাক্ষাৎ করে রোমান কুরিয়া পুর্নগঠন বিষয়ক তাঁর প্রৈরিতিক অনুশাসন 'মঙ্গলসমাচার ঘোষণা কর' নিয়ে আলোচনা করবেন। সারাবিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিভিন্ন পালকীয় কর্মকাণ্ডে রত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদেরকেই কার্ডিনাল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে কার্ডিনাল কলেজে ২০৮জন রয়েছেন; যাদের মধ্যে ১১৭জন ভোটদাতা এবং ৯১জন বয়সের কারণে ভোটদাতা নন। আগস্টের ২৭ তারিখে কার্ডিনালদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২২৯ জন যাদের মধ্যে ১৩১জন ভোটদানে যোগ্য থাকবেন।

বিশ্বের প্রায় সকল প্রান্ত থেকেই নতুন কার্ডিনালদের মনোনয়ন করা হয়েছে। ৮জন ইউরোপ থেকে, ৬জন এশিয়া থেকে, ২জন আফ্রিকা থেকে, ১জন উত্তর আমেরিকা থেকে এবং ৪জন সেন্ট্রাল ও লাতিন আমেরিকা থেকে। নতুন কার্ডিনালেরা হলেন;

১। আর্চবিশপ আর্থার রচে, রোমান কুরিয়ার ঐশ উপাসনা ও সাক্রামেন্ত বিষয়ক কমিটির প্রিফেক্ট
২। আর্চবিশপ লাজ্জারো ইউ হেউয়েং শিক্, রোমান কুরিয়ার যাজক বিষয়ক কমিটির প্রিফেক্ট
৩। আর্চবিশপ ফের্ন্দাদো ভেরগেজ আলজাগা, এলসি, প্রেসিডেন্ট, ভাটিকান সিটিস্টেটের জন্য পোপীয় কমিশন
৪। আর্চবিশপ জ্যান-মার আভেলিন, মার্সাইয়ের মেট্রোপলিটান আর্চবিশপ (ফ্রান্স)
৫। বিশপ ওকপালেকে, একদুভোলবিয়ার বিশপ (নাইজেরিয়া)
৬। আর্চবিশপ লিওনার্দো উলরিক স্টেইনের, ওএফএম, মানায়াসের মেট্রোপলিটানের আর্চবিশপ (ব্রাজিল)
৭। আর্চবিশপ ফিলিপে নেরী আন্তনিও সেবাস্তিয়াও দি রোজারিও ফের্ররাও, গোয়া ও ডামাও'র আর্চবিশপ (ইণ্ডিয়া)
৮। বিশপ রবার্ট ওয়াল্টার ম্যাকএলরয়, সানদিয়েগোর বিশপ (আমেরিকা)
৯। আর্চবিশপ ভিরজিলিও দো কার্মো দ্যা সিলভা, এসডিবি, দিলি'র আর্চবিশপ, (পূর্ব তিমুর)
১০। বিশপ অস্কার কান্তোনি, কমোর বিশপ (ইতালি)
১১। আর্চবিশপ আন্তনী পুলা, হায়দ্রাবাদের আর্চবিশপ (ইণ্ডিয়া)
১২। আর্চবিশপ পাউলো চেজার কস্তা, ব্রাসিলিয়ার আর্চবিশপ (ব্রাজিল)
১৩। বিশপ রিচার্ড কুজা বাওয়াবার.ওয়ার বিশপ, (ঘানা, মধ্য আফ্রিকা)
১৪। আর্চবিশপ উইলিয়াম গো সেং চাই, সিঙ্গাপুরের আর্চবিশপ (সিঙ্গাপুর)
১৫। আর্চবিশপ আদালরের্তো মার্তিনেজ ফ্লোরেস, আসুনচাঁও এর মেট্রোপলিটান আর্চবিশপ (প্যারাগুয়ে)
১৬। আর্চবিশপ জর্জোর মারেংগো, আইএমসি, উলানবাতারের এ্যাপস্টলিক প্রিফেক্ট (মঙ্গোলিয়া)
১৭। আর্চবিশপ জর্জ এনরিকো জিমেনেজ কারভাজাল, কার্তাজেনার অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ (কলম্বিয়া)
১৮। বিশপ লুকাশ ব্যান লয়, এসডিবি, গ্রেন্টের অবসরপ্রাপ্ত বিশপ (বেলজিয়াম)
১৯। আর্চবিশপ আরিগো মিগ্লিও, কাগ্লিআরির অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ (ইতালি)
২০। ফাদার জানফ্রাংস্কো ঘিরলান্ডা, এসজে, ঐশতত্ত্বের অধ্যাপক
২১। মন্সিনিয়র ফরতোনাতো ফ্রেজ্জা, সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার ক্যনন। - **তথ্যসূত্র :** *news.va*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ -এর নিম্নলিখিত পদের জন্য খ্রিষ্টান প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে:-

ক্র. নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	অভিজ্ঞতা
০১	অফিস সহকারী (ম্যাসেঞ্জার) বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে (শিক্ষানবিশকালীন ৬ মাস)	০১ জন	অষ্টম শ্রেণী অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।	২৫-৩৫	পুরুষ	➢ উপস্থিত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। ➢ কমপক্ষে ০১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী :-

১) পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত। (মোবাইল নাম্বার-সহ)
২) ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসেবে দিতে হবে (যিনি আপনার সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত আছেন)।
৩) শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত ফটোকপি ১ কপি।
৪) সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৫) খামের উপরে পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৬) অফিসের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
৭) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
৮) শিক্ষানবিশ কালীন সময় ৬ মাস প্রয়োজনে আরও ৩ মাস বাড়ানো হবে।
৯) আবেদনপত্র **আগামী ২০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট সশরীরে পৌঁছাতে হবে।
১০) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

সভাপতি/সম্পাদক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া,
গুলশান, ঢাকা-১২১২।
email:mcccultd@gmail.com

বিজ্ঞ/১৬৮/২২

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে আহ্বান দিবস পালন

ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস □ "তোমরা আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ ধরা জেলে *(মথি ৪:১৯)*।" উক্ত মূলভাবের আলোকে গত ২০ মে রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গৌরনদী ধর্মপল্লীতে আহ্বান সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত আহ্বান সেমিনারে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আহ্বান সেমিনার শুরু করা হয় এবং পরবর্তীতে এলএইচসি গঠনপার্থীদের নাচের মধ্যদিয়ে সকলকে বরণ করে নেয়। গৌরনদী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ প্রদীপ প্রজ্বালন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের মধ্যদিয়ে সেমিনার আরম্ভ করেন। উক্ত আহ্বান সেমিনারে ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস, সিস্টার আইরিন আরএনডিএম, সিস্টার চম্পা এবং সিস্টার প্রীতি এলএইচসি তাদের জীবনাহ্বান সহভাগিতা করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ তার জীবনাহ্বান সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর সকলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করে এবং পরে সকলকে পবিত্র বাইবেলের আহ্বান বিষয়ক ঘটনাবলির উপর নাটিকা উপস্থাপন করে। আহ্বান বিষয়ে নাটিকা উপস্থাপনের পর তাদেরকে ক্ষুদ্র উপহার ও ধন্যবাদ জানিয়ে আহ্বান সেমিনারের সমাপ্তি করা হয়॥

ডি মাজেনড গির্জার প্রতিপালকের পর্ব পালন

প্লাবন রোজারিও ওএমআই □ গত ২২ মে, রোজ রবিবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ডি মাজেনড গির্জার প্রতিপালক 'সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড' এর পর্ব মহা-সমারোহে পালন করা হয়। পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ নয় দিন ব্যাপী নভেনা প্রার্থনা করা হয় এবং নভেনার নবম দিনে ভেসপার উৎসবের আয়োজন করা হয় যার মধ্যে ছিল (পবিত্র খ্রিস্টযাগ, আরাধ্য সংস্কারের আরাধনা এবং মহাআশীর্বাদ)। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি তার উপদেশে সাধু ইউজিন ডি মাজেনডের আধ্যাত্মিক ও মানবিক গুণাবলির উপর আলোকপাত করেন এবং সকল ভক্তজনগণকে এই সাধুর জীবনাদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করতে বলেন। পরিশেষে ডি মাজেনড গির্জার পরিচালক ফাদার সুবাস পুলক গমেজ ওএমআই সকল খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সাহায্য সহযোগিতার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। উল্লেখ্য যে, এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদার অজিত ভিক্টোর কস্তা ওএমআই, অবলেট ডেলিগেশন সুপিরিয়র, ভাটারা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শীতল থিওটোনিয়াস কস্তা ও বেশ কয়েকজন অবলেট ফাদারগণ এবং ওএলএস সিস্টারগণ এবং প্রায় ৩০০ জন খ্রিস্টভক্ত। পরিশেষে সবার জন্য পর্বীয় বিস্কুট ও জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়॥

পাগাড় প্রভু যিশুর ধর্মপল্লীতে 'নবনীতা সংঘের' রজত জয়ন্তী উৎসব পালন

তন্ময় কস্তা □ গত ২০ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার ধর্মপল্লীর নবনীতা সংঘের ২৫ বছরের জুবিলী বা রজত জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। গত ১৯ মে, বিকালে সংঘের ভগ্নীদের নিয়ে পবিত্র আরাধনা করা হয় এবং পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। পবিত্র আরাধনার পর সংঘের ভগিনীগণ চন্দন তিলক দিয়ে ফাদার এবং সিস্টারদের বরণ করে নেয় এবং ব্যাচ পরিয়ে দেয় এবং পরে দু'জন ফাদার এবং একজন সিস্টার সংঘের সদস্যাদেরকে চন্দন তিলক দিয়ে মঙ্গল প্রার্থনা করেন এবং তাদেরকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তারপর সংঘের ভগিনীগণ নৃত্য পরিবেশন করেন এবং রাতের আহারের মধ্যদিয়ে ঐ দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়।

২০ মে সকাল ৯:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করা হয়। খ্রিস্টযাগের পূর্বে ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় এবং শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করা হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ২৫ জন ২৫ টি প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। ফাদার তপন ডি' রোজারিও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি তার সহভাগিতায় কিছু স্মৃতি সহভাগিতা করেন এবং এই সংঘের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা যেন সকলে পালন করে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। খ্রিস্টযাগের পর সংঘের পক্ষ থেকে বিশেষ স্মরণিকার করা হয়। এরপর ফেষ্টুন ও কবুতর উড়ানো হয় এবং কেক কাটা হয়। দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিরতি দেয়া হয় এবং বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে, পাল-পুরোহিত ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা এই জুবিলী অনুষ্ঠান আয়োজন করার পিছনে যারা নানা ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত জুবিলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৮ জন ফাদার, ৯ জন সিস্টার, ১ জন মেজর সেমিনারীয়ানসহ ৪০০ জনের অধিক খ্রিস্টভক্ত॥

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান ও প্রার্থনাবিতান

- ❒ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ❒ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ❒ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ❒ সলতে
- ❒ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-২০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 20
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ২০
Regd. No. DA-33
❖ 5 - 11June, 2022, ২২ - ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মমতাময়ী মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করি কৃতজ্ঞচিত্তে

"তুমি দিয়েছিলে, তুমি নিয়েছো প্রভু, ধন্য তোমার নাম
তোমার পৃথিবী, তোমারই স্বর্গ, পূর্ণ সকল ধাম।"

সকলি ফুরায়ে যায় মা
জনমের সাধ ডাকিগো
মা তোমায় কোলে
তুলে নিতে ...

স্বর্গীয়া ভেরোনিকা প্রমিলা গোমেজ

জন্ম : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : বালিডিওর, গোল্লা মিশন

প্রাণপ্রিয় মা,

যে আলো জ্বালিয়েছো তুমি, সেই আলোয় আলোকিত আমাদের পথ-শ্রদ্ধায় স্মরণে মাগো তোমাকে স্মরি। আজ ১৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তোমার ঐশধামে যাত্রার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এইদিনে তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে না ফেরার দেশে। মাগো তোমার শূন্যতা আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি, তবু তুমি থাকবে সর্বদা আমাদের হৃদয়-মন্দিরে।

মার অপরিসীম স্নেহ, মায়া মমতা ও ভালোবাসা খুব গভীরভাবে মনে উপলব্ধি করি।

ব্যক্তি জীবনে মা-মনি ছিলো সৎ, স্পষ্টবাদী এবং উদার চিত্তের পরোপকারী মানুষ। ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কুমারী মারীয়ার প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালোবাসা।

মা, তুমি আছো পরম পিতার সান্নিধ্যে, স্বর্গরাজ্য থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো যেন এই শোক সইবার শক্তি পাই। পিতা ঈশ্বরের কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, প্রভু যেন তোমাকে অনন্ত শান্তিতে বিশ্রাম দান করেন।

প্রিয় পাঠক, আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১৪ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার। অনুগ্রহপূর্বক সকলেই প্রার্থনায় স্মরণ করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে
তোমারই আদরের সন্তানেরা
তেজগাঁও ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১৬২/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org